আল্লাহ আমার প্রভু

সৈয়দ আলী আহসান

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ আমার প্রভু

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ আমার প্রভু

সৈয়দ আলী আহসান

বাতায়ন প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
বাতায়ন প্রকাশন-এর প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১০/আগষ্ট ২০০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০৯
প্রচ্ছদ : সিকদার আবুল বাশার
ISBN : 984-8421-05-2
বাতায়ন প্রকাশন-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে শামীমা নাজনীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং জি. জি. অফ্‌সেট প্রেস ৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন নয়াবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।
মূল্য : ১৬০.০০ টাকা
Price Tk. 160.00 U.S. Dollar 3.00

www.nagorikpathagar.org

সুচিপত্র

আল্লাহর অস্তিত্ব ... ০৭
হে প্রভু আমি উপস্থিত ... ৬৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ
পীরসাহেব, হাকিমাবাদ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আল্লাহর অস্তিত্ব যাঁরা অনুভব করেন তাঁরা বলেন যে, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি আমাদের অন্তরে আছেন, তিনি আমাদের বাইরে আছেন। সমগ্র প্রকৃতি, আকাশমণ্ডল এবং বিশ্ব-ভূমার সর্বত্রই তিনি আছেন। সূফি ও সাধকগণ ধ্যানলোকে তাঁকে নিরীক্ষণ করেন এবং কর্মব্যস্ত সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে বিধাতার স্বাক্ষর পান। এ কারণে আল্লাহর নামটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ নামের কোন অর্থ নেই, কিন্তু এ নাম সকল অর্থের উর্ধ্বে; এ নামের কোন ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু এ নাম ব্যাখ্যাতীত; এ নাম কোন সীমাকে বোঝায় না অথবা কোন পরিবর্তনকে বোঝায় না— এ নাম একটি অপরিবর্তনীয় সীমাহীনকে বোঝায়।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী তাঁর 'মকতুবাত'-এ 'আল্লা' নামের রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, একজন যথার্থ মানুষ তাঁর অস্তিত্বের অনুকূলে আল্লাহকে খুঁজে পান। সেকারণে সূফিগণ মানব অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন, যে চেষ্টা একবার সাধক মনসুর করেছিলেন। তিনি নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই মহা প্রভুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশের সাধক কবি লালন শাহ্ তাঁর একটি গানে লিখেছেন— 'তিনি আমার প্রতিবেশী, একটি আরশীতে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, আমিও আমার আরশীতে আমার নিজের প্রতিবিম্বের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারি না।' এ গানটির ছত্রে ছত্রে একটি অসাধারণ আকুলতা ধরা পড়েছে।

আমি বিভিন্ন সময় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার চেষ্টা করেছি। অনেক মুর্শীদের কাছে গিয়েছি, কিন্তু আমার তৃষ্ণা মেটেনি। একাকী ধ্যানে বসে আমি ভেবেছি আমার জন্মের পূর্বের জীবন সম্পর্কে আমি জানি না, আমার মৃত্যুর পরের জীবন কি হবে তা-ও আমি জানি না। কিন্তু আমি অনুভব করি যে, আমি আছি। তার কারণ মহাপ্রভুর ছায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। আমি পাপমুক্ত নই, সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করি, কিন্তু পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন হয়তো হতে পারি না।

কিন্তু আমি আমার সংকীর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর 'অজুদকে' বুঝাবার চেষ্টা করি। পার্থিব সৃষ্টির পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাঁর পরিবর্তন নেই। তিনি আহাদ অর্থাৎ 'এক', কিন্তু ঐ একটি গণনা 'সংখ্যা' এক নয়। তিনি প্রকাশ্যে কিন্তু বাস্তব সমীকরণে দৃষ্টিগ্রাহ্য নন। এই যে তাঁর অনন্ত মহিমা সেটি জানবার একাগ্র চেষ্টায় আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলো 'আল্লাহর অস্তিত্ব' নামক বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। মাম্মী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ ইলিয়াসুর রহমানের ঐকান্তিক আগ্রহে গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হলো।

প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই নিঃশেষিত হয়েছে। বর্তমান মুদ্রণে কোন পরিবর্তন সাধন করা যায়নি।

সৈয়দ আলী আহসান

১ লা ফেব্রুয়ারি ২০০০ সাল

৬০/১ উত্তর ধানমণ্ডি

ঢাকা ১২০৭

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র সৃষ্টির সাক্ষ্য

মানুষ সব সময় সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রমাণ চায়, প্রমাণ না পেলে কোন সিদ্ধান্ত সে মেনে নিতে চায় না। একটি শিশুর চরিত্র যদি পরীক্ষা করি তাহলে দেখব যে সে অনবরত প্রশ্ন করে এবং প্রশ্ন না করলে তার সন্তুষ্টি হয় না। একই প্রশ্ন সে বারবার উচ্চারণ করে— 'কেন'? যদি একটি ধারালো ছুরি তার হাতের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা যায় তাহলে সে জানতে চাইবে কেন ছুরিটা সরিয়ে রাখা হল? উত্তরে যদি বলা হয় যে, ছুরিটাতে খুব ধার আছে। তাহলেও সে প্রশ্ন করবে 'কেন,' অর্থাৎ ধার আছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, শাকসব্জী এবং ফলমূল কাটতে হবে তাই এতে ধার আছে। তবুও শিশু সন্তুষ্ট হবে না। এরপরও সে জিজ্ঞেস করবে— 'কেন'?

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করতে গেলে এবং কারণ নির্ণয় করতে গেলে বহুবিধ সমস্যায় সৃষ্টি হয়। সে কারণে আমাদেরকে প্রমাণের জন্য একটি মানদণ্ড নির্ণয় করতেই হবে। অর্থাৎ যে কোন বিষয়েই একটি চূড়ান্ত প্রমাণের ব্যবস্থা না নিলে জটিলতা দূর করা যাবে না।

আমরা দেখি যে, দার্শনিকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মানদণ্ড নির্ধারণ করে গেছেন। সেসব মানদণ্ডের সাহায্যে দার্শনিক বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করে থাকি।

মানুষেরও অনবরত প্রশ্ন করবার একটি প্রবণতা আছে। সেই প্রবণতার কথা মনে রেখেই আমাদের প্রমাণের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা তথ্যের বিশ্বস্ত প্রমাণ তৈরি করতে হবে। এ প্রমাণগুলো না পেলে বিশ্বাস নির্মাণ করা সম্ভবপর হবে না। পবিত্র কোরআন শরীফের সত্যতা প্রমাণ করতে হলেও এ বিবেচনাটি মনে স্থান দিতে হবে।

একজন চিন্তাশীল খ্রীষ্টানকে যদি জিজ্ঞেস করি সে কেন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে আছে? সে তার উত্তরে বলবে, "পুনর্জাগরণের যে অলৌকিকতা তার মাহাত্ম্যেই আমি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে আছি।" তার এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে দু হাজার বছর আগেকার একটি ঘটনা। একজন মানুষ মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এই অলৌকিক ঘটনাটাই হচ্ছে তার বিশ্বাসের 'পরশ পাথর'। কেননা তার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা এই পরশ পাথরের উপর নির্ভরশীল। এই পরশ পাথর তো দু হাজার বছর আগে ছিল, এখনো কি এই পরশ পাথরটি আছে? এখনও কি কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা যায়? এই প্রশ্ন দুটির কোন উত্তর নেই। খ্রীষ্টানগণ এর উত্তরে শুধু বলে থাকে যে, যীশু খ্রিষ্টকে ভজনা করলেই আমাদের মুক্তি হবে। কেননা তিনিই ত্রাণকর্তা।

একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'আপনি কেন মুসলমান? আপনার বিশ্বাসের পিছনে কোন অলৌকিক ঘটনা আছে কি? বিশ্বাসী মুসলমান তখন কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে বলবেন, 'আমার বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে একটিমাত্র অলৌকিক বস্তু আছে, সে অলৌকিক হচ্ছে কোরআন শরীফ। চৌদ্দশ বছর আগে এটা যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। চৌদ্দশ বছর আগে এটাকে অবলম্বন করেই মুসলমানরা যেভাবে ধর্মকর্ম নির্বাহ করত, আজও তাই করে। খ্রীষ্টানদের অলৌকিকতা যীশু খ্রীষ্টের জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু আজ আর কোন খ্রীষ্টান মৃতকে জীবনে আনতে পারে না। কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের জন্য যা অলৌকিক ছিল, আজও একই অবস্থায় তা অলৌকিক।'

সকল পয়গম্বরদেরই কিছু না কিছু নিদর্শন ছিল। সে সব নিদর্শনের সাহায্যেই তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। হযরত মুসা যাদুকরদের বিরুদ্ধে এবং ফেরাউনের বিরুদ্ধে অলৌকিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে রোগমুক্ত করেছেন এবং মৃতকে প্রাণ দিয়েছেন। সর্বশেষ পয়গম্বরকে একটিমাত্র নিদর্শন দেয়া হয়েছিল। সে নিদর্শন হচ্ছে পবিত্র কোরআন, এ নিদর্শনটি এখনো আমাদের কাছে আছে। যেহেতু শেষ নবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে গেছে, সে কারণে কোরআন শরীফের বিদ্যমানতা একান্তই স্বাভাবিক এবং যথার্থ। চৌদ্দশ বছর আগের মুসলমানরা ধর্মীয় যে আচরণের মধ্যে বাস করত, আজকের মুসলমানরাও সেই একই আচরণের মধ্যে বাস করে। রাসূলে খোদার নিকটে যারা ছিলেন, তাদের জন্য যেমন কোরআন শরীফ ছিল, আমাদের জন্যও তেমনি কোরআন শরীফ আছে। এটা তাদের জন্য যেমন নিদর্শন ছিল আমাদের জন্যও এটা তেমনি 'নিদর্শন'।

কোরআন শরীফ এমন একটি গ্রন্থ যার লেখক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি দাবি করছেন যে বিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্নে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জীব সৃষ্টির সূচনালগ্নেও। আমরা আল্লাহকে প্রশ্ন করতে পারি, 'আপনি আমাদের প্রমাণ দিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে এবং জীবন যখন আরম্ভ হল তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন।' কোরআন শরীফের সূরা আম্বিয়াতে এর উত্তর আছে ঃ

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, সকল আকাশ ও ভূ-মণ্ডল একটি একক ছিল এবং আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম? প্রতিটি জীবিত প্রাণকণাকে আমরা পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?' (২১ : ৩০)

এখানেই কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহর উপস্থিতির প্রমাণ হয়। প্রমাণ যে, সৃষ্টির আদিতে তিনি ছিলেন এবং সৃষ্টির সকল রহস্য তাঁর সম্মুখেই উদঘাটিত হয়েছে। আমরা বর্তমানে জানি যে, বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যের মূলে বিজ্ঞানীগণ একটা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। সে তত্ত্বটিকে ইংরেজীতে বলা হয়, 'বিগ ব্যাং থিয়োরী'। এই তত্ত্ব অনুসারে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী যাকে বলা হয় 'মনোরক' আকস্মাৎ এক সময় বিদীর্ণ হয় এবং চতুর্দিকে বিস্তারিত হতে থাকে। এভাবেই আমরা পৃথিবীকে পেয়েছি। এটি আধুনিক সময়েরই বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা একই কথা বলেছেন।

কয়েক বছর আগে একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় এই 'বিগ ব্যাং থিয়োরী' আবিষ্কারের জন্য। এ ছাড়া প্রায় দুশ বছর আগে একজন ডাচম্যান অণুবীক্ষণকে বিশুদ্ধ করেন এবং তার সাহায্যে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, প্রতিটি জীবকোষে প্রায় আশি ভাগ পানি আছে। এভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা কোরআন শরীফে আল্লাহর সাক্ষ্যটি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছি যে, বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে বিধাতা ছিলেন, তিনিই পৃথিবীকে একটি সত্তাকে ভেঙে নির্মাণ করেছেন এবং তিনি পানি থেকে জীবকোষ নির্মাণ করেছেন।

আধুনিক বিশ্বে বিগ ব্যাং তত্ত্বটির আবিষ্কারক ব্রাসেলসের পদার্থ ও অংকশাস্ত্রবিদ জর্জ ল্যাসাৎর। তিনি বলেন, 'শত শত কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ একটি মাত্র পরমাণুতে সংহত ছিল। পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সৌরজগতের জন্ম দেয়।'

www.nagorikpathagar.org

তত্ত্ব আলোচনা করতে অথবা কোন ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে গেলে কোন না কোন একটা বিশ্বাসে আমাদের স্থিরনিশ্চয় হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে প্রশ্নের কোন অন্ত থাকবে না এবং কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা একেবারে অসম্ভব হবে। একটি ঠিক জায়গায় আমাদের পা রাখতে হবে। তারপরই তো অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন। পৃথিবীতে একটি প্রমাণের আরো প্রমাণ এবং আরো অধিকতর প্রমাণ হতে পারে না। একটি প্রমাণেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিজ্ঞানীরা যখন একটি অনুসন্ধান করা আরম্ভ করেন তখন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এবং দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। যখন দেখা যায়, সব অনুসন্ধানই একটি সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে তখনই বলা হয়, আমরা যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

আমরা যখন কোরআন শরীফকে পরীক্ষা করে এবং এর অলৌকিক উৎস সন্ধান করতে যাই তখন আমরা ইসলামের বিশ্বাসে এসে উপনীত হই। এই একটা পদ্ধতি রয়েছে যা প্রতিটি মুসলমান মান্য করে। কিন্তু যারা মুসলমান নয় তাদের বিশ্বাসের জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা যদি অন্যান্য ধর্মের পয়গম্বরগণ কি বলেছেন সেগুলো ঠিকমতো পরীক্ষা করতে পারি এবং পরীক্ষা করে ইসলামের বিশ্বাসে এসে উপনীত হই তাহলে আমরা বলতে পারব—'সর্বদিক থেকে পরীক্ষা করে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, মহাগ্রন্থ কোরআন অলৌকিক।' এভাবেই আমরা মহাবিশ্ব যে বিস্তারিত হয়ে চলেছে কোরআন শরীফের সাহায্যে যেমন সে সত্যকে আবিষ্কার করি, আবার ল্যাসাৎর-র এর আবিষ্কারের সাহায্যে একই সত্যে এসে পৌঁছি। এভাবেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল না ততদিন পর্যন্ত আমরা মহাপ্রভু আল্লাহর বাণীর সুস্পষ্ট অর্থ না বুঝতে পেরে শুধুই বলতাম, একমাত্র আল্লাহই এর অর্থ জানেন। কিন্তু এখন আর সেকথা না বুঝে বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সিদ্ধান্তের বহু পূর্বে আল্লাহ নিজেই মহাবিশ্বের বিস্তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোরআন শরীফের উননব্বই সূরার সপ্তম আয়াতে 'ইরাম' নামক একটি শহরের কথা বলা হয়েছে। ইরাম শহরের নাম ইতিহাসে নেই। কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাকাররাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হননি।

তারা সম্ভবত এটা প্রতীকগত কোন নাম এরকম কথা বলেছেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে সিরিয়ার 'এরলূস' নামক একটি পুরানো শহরে খননকার্যের ফলে কিছু পুরানো লিখন পাওয়া যায়। এ লিখনগুলো মাটির ফলকের ওপর খোদিত ছিল। এ সমস্ত লিখন পরীক্ষা করে চার হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে 'ইরাম' শহরের উল্লেখ আছে। এরলূস অঞ্চলের লোকজন 'ইরাম' শহরের লোকজনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এ সত্যটা আমরা আবিষ্কার করলাম মাত্র সেদিন–১৯৭৩ সালে। তাহলে কোরআন শরীফের মধ্যে এই শহরের নাম এলো কি করে? এর উত্তর এখন আমরা সহজেই দিতে পারি। যেহেতু কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং তিনি সৃষ্টির সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিলেন, তাই ইরাম শহরকে তিনি জানতেন এবং আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে তাঁর রাসূলকে প্রথম জানিয়েছেন এবং বর্তমানে আমরাও এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি।

কোরান শরীফের বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

'তোমরা কি দেখোনি কিভাবে তোমাদের প্রভু আদ জাতির প্রতি ব্যবহার করেছিলেন,

www.nagorikpathagar.org

কি করে তিনি উচ্চ স্তম্ভযুক্ত ইরাম শহরকে ধ্বংস করেছিলেন, যার সমতুল্য আর কোন শহর পৃথিবীতে ছিল না।' (৮৯ : ৬৬-৮)

আল্লামা ইউসুফ আলী উক্ত আয়াতের টীকায় বলেছেন, 'ইরাম সম্ভবত আদ জাতির রাজধানীর নাম ছিল। কোন কোন ব্যাখ্যাকার ইরামকে আদ জাতিদের একজন প্রথিতযশা বীরের নাম হিসেবে ধারণা করেন।'

দেখা যাচ্ছে যে, কোন টীকাকারই ইরামের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে পাননি, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে পাননি এবং পৃথিবীর লোক-পুরাণেও পাননি। সুতরাং পৃথিবীর কোন মানুষ ইরাম নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ইরামের অস্তিত্ব জানতেন শুধু আল্লাহ। তাই তিনি ইরামের উদাহরণ দিয়েছেন এবং আজ আমরা বিস্মিত হয়ে অনুভব করছি যে, কোরআন শরীফ মানুষের সৃষ্টি নয়। এ গ্রন্থ আল্লাহর বাণীসম্বলিত একটি অলৌকিক অভিজ্ঞান।

বর্তমানে বিশ্বে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের পর ক্ষুদ্রতম বস্তু সম্পর্কে মানুষের একটি ধারণা জন্মেছে। অতীতে এ ধারণাটি ছিল না। কোরআন শরীফ যখন ঐশীবাণী হিসাবে অবতীর্ণ হয় তখন পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কোন অগ্রযাত্রাই ছিল না এবং ক্ষুদ্রতম বিষয় সম্পর্কে ভাববার কোন সুযোগ পৃথিবীর মানুষের ছিল না। কিন্তু কোরআন শরীফে ক্ষুদ্রতম বস্তুর বিষয়ে সঙ্কেত আছে। কোরআন শরীফে 'যাররাহ' বলে একটি শব্দ আছে। বর্তমানে এই শব্দটির অর্থ করা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অণু হিসাবে যাকে আমরা 'এ্যাটম' বলি। যখন বৈজ্ঞানিকগণ যাররাহ শব্দটির সন্ধান পেলেন তখন তারা বললেন যে— 'যাররাহ' এ্যাটম হতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ্যাটমের চেয়েও তো ক্ষুদ্রতম অণু আছে।

এর উত্তরও কোরআন শরীফে পাওয়া যায়। কোরআন শরীফে সূরা ইউনুস-এর ৬১তম আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলছেন— 'কোন কিছুই বিশ্ব বিধাতার কাছ থেকে লুক্কায়িত নয় অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন কিছু তা-ও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই। এ সমস্ত কিছুই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে।'

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান বিজ্ঞানের অণু-পরমাণু এবং তাদের বিভাজন সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআন বহু পূর্বেই ইংগিত করেছে।

ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে— 'যে মুহূর্তে একজন মানুষ ইসলাম কবুল করে সে মুহূর্তেই তার অতীতের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করা হয়ে যায়। ইসলামের আমন্ত্রণ হচ্ছে, আপনি ইসলামকে গ্রহণ করুন এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে আপনার অতীত মুছে যাবে। আপনি পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।'

কোরআন শরীফে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর একজন শত্রুর সুস্পষ্টভাবে নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। সে শত্রু হচ্ছে আবু লাহাব। বলা হয়েছে—'আবু লাহাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।' এই ওহী নাযিল হওয়ার পর আবু লাহাব ওহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য ইসলাম কবুল করত তাহলে কোরআন শরীফের আয়াতটি মিথ্যা প্রমাণিত হতো। কিন্তু আবু লাহাব ইসলাম কবুল করেনি এবং কোরআন শরীফের বাণী চিরকালের জন্য অমোঘ এবং সত্য হয়ে রয়েছে।

কোরআন শরীফে সূরা আররূম-এ পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের একটি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং যে সময় রোমানদের ওপর পারসিকরা বিজয়ী হয়েছিল সে সময়ই ওই ওহীটি নাযিল হয়। মানুষের পক্ষে তখন বিশ্বাস করা অকল্পনীয় ছিল যে, রোমকদেরকে যারা

www.nagorikpathagar.org

পরাজিত করল তাদের ধ্বংস এত দ্রুত হতে পারে। কিন্তু কোরআন শরীফ এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছে এবং তা সত্যও হয়েছে। কোরআন শরীফের এক জায়গায় সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, ঢেউ যখন অগ্রসর হয় তখন দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকার থাকে। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মরুভূমির সন্তান ছিলেন। তিনি সমুদ্র কখনো দেখেননি। সুতরাং সমুদ্র তরঙ্গ কি করে দেখবেন? এবং কি করেই বা দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান যে অন্ধকার হয় তা জানবেন? এখানেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কোরআন শরীফ লেখেননি। কোরআন শরীফ লিখেছেন মহান প্রভু আল্লাহ যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। মূলত প্রচণ্ড ঝড়ের সময় সমুদ্র যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন দ্রুতগতি তরঙ্গগুলোর মধ্যবর্তী অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

পৃথিবীতে কোরআন শরীফই একমাত্র গ্রন্থ যা পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধভাবে এসেছিল। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এবং খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ অনবরত পরিবর্তিত হয়েছে এবং সংশোধিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে এগুলোর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মের কয়েকটি মহাসম্মেলন হয়েছে। এসব মহাসম্মেলনে বুদ্ধের বাণী সংশোধন করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কোরআন শরীফ একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, যখন যে উচ্চারণে কোনআন শরীফ নাযিল হয়েছে, অবিকল সেই উচ্চারণকে এখনো ধরে রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের সূরা হুদ-এর প্রথম আয়াতে বলেছেন :

'আলিফ লাম রা। এটা এমন একটি গ্রন্থ যার বাণী মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় এবং এই বাণী ক্রমশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বাণী এমন একজনের কাছ থেকে এসেছে যিনি পরম বিজ্ঞ এবং সকল কিছু সম্পর্কেই যিনি জ্ঞান রাখেন।'

কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি 'আমরা' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন? এ শব্দটি ব্যবহার করবার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ সব সময় তাঁর সৃষ্ট জগতের সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। সে কারণেই তিনি এবং সৃষ্ট জগৎ মিলে 'আমরা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহ্ সবসময় এবং সকল অস্তিত্বে বিদ্যমান। সুতরাং সকল অস্তিত্বের সমাহার এবং আল্লাহ— এই দুয়ে মিলে 'আমরা' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। রাসূলে খোদার জীবনেও এই দুইয়ের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর স্বজনদের ইসলামে আহ্বান করলেন তখন তিনি সকলের মধ্য থেকে একজনকে চেয়েছিলেন— যিনি তাঁর সকল ধর্মীয় কর্মে সহায়ক হবেন। হযরত আলী (রাঃ) তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, তিনি রাসূলে খোদার সঙ্গে থাকবেন। রাসূল (সাঃ) যখন তায়েফে গেলেন তখন তিনি কাউকে না জানিয়ে একমাত্র জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আবার মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র একজন সঙ্গী, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)। এসব তথ্য থেকে একটি সত্য প্রমাণিত হয় যে, দুজন মিলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সে সিদ্ধান্তটাই বিশুদ্ধ। অধিকসংখ্যক লোক একত্রে মিলে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

কোরআন শরীফে অনেক জায়গায় তুলনা উপস্থিত করা হয়েছে একের সঙ্গে অন্যের। এ তুলনা উপস্থিত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছেন। কৌশলটি হচ্ছে, যে দুটি নাম এবং বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে সে দুটি নাম অথবা বস্তু সমান সংখ্যকভাবে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর বাণীতে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবেই

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তায়ালা সমতার নির্দেশ করেছেন। কোরআন শরীফে সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

'আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে ঈসার মিসাল বা তুলনা হচ্ছে আদমের সঙ্গে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন ধূলি থেকে এবং তখন বলেছিলেন তুমি হও এবং তিনি অস্তিত্ব পেয়েছিলেন।'

এটা যে সত্য তা আমরা জানি। তার কারণ মানব-জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এদের কারোরই জন্ম হয়নি। আদম (আঃ)-এর মাতাও ছিল না, পিতাও ছিল না এবং ঈসা (আঃ)-এরও পিতা ছিল না। এখন এই তুলনাটি যে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা কোরআন শরীফে এ দুটি নামের মোট সংখ্যা অনুসন্ধান করি। দেখা যাচ্ছে যে, কোরআন শরীফে ঈসা (আঃ) নামটি পঁচিশ বার এসেছে বিভিন্ন সময়ে। তেমনি আদম (আঃ) নামটিও এসেছে পঁচিশ বার।

কোরআন শরীফ একসঙ্গে পুস্তকাকারে রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ের বিস্তারের মধ্যে কোরআনের বাণীগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং এই বাণী যে মানুষের নয় তা বোঝা যায় যে এই দুটি নামের আবির্ভাবের সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে এক। আল্লাহ তায়ালার অলৌকিক স্মৃতিভাণ্ডার থেকে এ দুটি নাম উচ্চারিত হয়েছে। তাই সেগুলোর সংখ্যা– গণনাও ঠিকই হয়েছে।

কোরআন শরীফের সূরা আল আরাফ-এ ১৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন :

'যারা আমাদের সুস্পষ্ট চিহ্নগুলো অস্বীকার করে তাদের তুলনা হচ্ছে কুকুরের সঙ্গে।'

গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, 'যারা আমাদের সুস্পষ্ট চিহ্নগুলো অস্বীকার করে' এই কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে কোরআন শরীফে এসেছে এবং মোট পাঁচবার এসেছে। তেমনি আল কাল্ব অর্থাৎ কুকুর শব্দটি মোট পাঁচবার এসেছে। এরকম অনুসন্ধান করলে আরো অনেক শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে উপমান ও উপমেয়-এর মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফের বাণী এবং উচ্চারণ সর্বসময়ের জন্য পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। এগুলো এমন এক শৃংখলার মধ্যে আবদ্ধ এবং এমন এক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত যে, পৃথিবীর কোন মানুষের সাধ্য নেই এগুলোর মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বের করে। এ এক অলৌকিক পরিপূর্ণতা যার কারণে কোরআন শরীফ নিজেই নিজের তুলনা। এই তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো যেখানে তুলনাটি অসম, সেখানে দুইটি উল্লেখের সংখ্যাও অসম। যেমন— কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 'সুদ' এবং 'বাণিজ্য' এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই শব্দ দুটির একটি কোরআন শরীফে এসেছে ছয়বার এবং অন্যটি এসেছে সাতবার। এভাবে আরো অনেক উদ্ধৃতি দেয়া যায় যেখানে অসমতা প্রমাণের জন্য দুইটি শব্দের উল্লেখেরও তারতম্য ঘটানো হয়েছে।

এর একটি ব্যতিক্রম কোরআন শরীফের এক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটা ব্যতিক্রম নয়। সূরা আল-মায়েদা-এর ১০০ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

'বল, যা পাপ এবং অপবিত্র তার সঙ্গে শুভ এবং কল্যাণের তুলনা হয় না। যদিও পাপের অতিরিক্ততা তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং তোমরা যারা জ্ঞানবান তারা আল্লাহকে ভয় পাবে যেন তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারো।'

কোরআন শরীফে পাপের জন্য 'আল খাবিস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুণ্য

www.nagorikpathagar.org

ও কল্যাণের জন্য 'আল তা়ইব' ব্যবহার করা হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, কোরআন শরীফে এ শব্দ দুটির উল্লেখের মধ্যে সমতা আছে। দুটি শব্দই সাতবার করে এসেছে। এটা কি করে হল? আমরা সূরা 'আনফাল'-এ যদি যাই তাহলে দেখতে পাই আল্লাহতায়ালা বলছেন :

'অপবিত্রকে পবিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপবিত্রকে একের পর একে পুঞ্জীভূত করে এবং সেগুলোকে নরকের আগুনে ফেলে দেয়।'

উক্ত আয়াত পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পাপের সংখ্যা বেশি, যদিও পাপ শব্দটি সাতবার এসেছে। 'পুঞ্জিভূত করা' বলার মধ্য দিয়ে পাপের সংখ্যা যে বেশি তা বোঝানো হয়েছে। এহেন বিস্ময়কর বিবেচনা এবং নিরীক্ষণ পৃথিবীতে একমাত্র কোরআন শরীফেই আছে, আর কোথাও নেই।

পাশ্চাত্য-সমালোচকগণ দীর্ঘকাল ধরে এটা বলে আসছেন যে, কোরআন শরীফে চান্দ্রমাস অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তার কারণ কোরআন শরীফ যার লেখা, সৌরবর্ষ সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। তারা এই যক্তিটি উপস্থিত করেছেন এই বলে যে, সৌরবর্ষই হচ্ছে যথার্থ বর্ষ গণনা। কেননা চান্দ্রবর্ষে আমরা প্রতিটি বছরের ১১টি দিন কম পাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই বিশ্লেষণ যে সত্য নয় তার প্রমাণ রয়েছে সূরা আল 'ক্বাফ'-এ। সেখানে আল্লাহতায়ালা সময় গণনার এবং সময় হারিয়ে যাওয়ার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার সাহায্যে টীকাকারগণ এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সূরা আল ক্বাফ-এর বিশ্লেষণ অনুসারে তিনশত সৌরবর্ষ, তিনশত নয় চন্দ্র বর্ষের সমান।

কোরআন শরীফে 'মাস'-এর আরবী প্রতিশব্দ 'শহর'। এই 'শহর' শব্দটি কোরআন শরীফে বারো বার এসেছে। আমরা জানি যে, বারো মাসে এক বছর হয়। বারো মাস আমরা যখন পেলাম, তখন আমরা অনুসন্ধান করে দেখব যে, কয়টি দিবসে এক বৎসর হয় তা কোরআন শরীফে আছে কিনা। দিনের আরবী হচ্ছে 'ইয়াউম'। এ শব্দটি কোরআন শরীফে ৩৬৫ বার এসেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোরআন শরীফের রচয়িতার সৌর বছর এবং মাস গণনার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

২৫ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর মানুষ জানতো যে, চন্দ্র-সূর্য এবং পৃথিবী প্রতি উনিশ বছরে একই সরলরেখায় অবস্থান গ্রহণ করে। একজন গ্রীক পণ্ডিত এটাকে প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম ছিল মেতন, এবং তাঁর নামেই এ ঘটনাকে বলা হয়, 'মেতনীয় বৃত্ত'। কোরআন শরীফের শব্দসূচী পরীক্ষা করলে দেখা যাবে 'সানাহ' শব্দটি পবিত্র গ্রন্থে উনিশবার এসেছে। 'সানাহ্' আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বছর।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল ধরে, বিশেষ করে মধ্যযুগে কোরআন শরীফের মধ্যে নানা ধরনের অসামঞ্জস্য বের করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে, বিশেষ করে কম্পিউটার প্রয়োগের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি যে, কোরআন শরীফের শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে সৃশৃংখল। খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ এরকম সন্দেহ কখনো কখনো প্রকাশ করেছেন যে, যে কোরআন শরীফ আমরা পাচ্ছি এখন সেটা সর্বাংশে বিশুদ্ধ নয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির দ্বারা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, ওহী যখন নাযিল হয়েছিল তখন কোরআন শরীফের শব্দগুলো যে রকম ছিল এখনো অবিকল সে রকম আছে। বহুদিন পর্যন্ত কোরআন শরীফের শব্দগত ভারসাম্য এবং যুক্তিযুক্ত বিন্যাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-

www.nagorikpathagar.org

পণ্ডিতগণ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা একটি বিস্ময়কর উপলব্ধিতে এসেছি যে, কোরআন শরীফের শব্দ ব্যবহারের মধ্যে কোন প্রকার অসতর্কতা নেই। কোরআন শরীফে 'ক্বালু' শব্দটি অর্থাৎ 'তারা বলে' এ কথাটি ৩৩২ বার এসেছে। স্বাভাবিকভাবে এ শব্দের বিপরীতটি অর্থাৎ 'কুল' শব্দটি ঠিক একই সংখ্যকবার কোরআন শরীফে এসেছে। 'কুল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বলা'। এটি একটি অনুজ্ঞা।

কোরআন শরীফের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর উৎস সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর এ মহাগ্রন্থের অভ্যন্তরেই আছে। এর উৎস সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয়ের উত্তর কোরআন শরীফ নিজেই দিয়েছে। খ্রীষ্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় বিশ্বকোষ আছে। যার নাম 'ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া'। সেখানে কোরআন শরীফের উৎস সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে বলা হয়েছে যে— 'বহু শতাব্দী ধরে কোরআন শরীফ কোন্ উৎস থেকে এবং কিভাবে এসেছে তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু এ তত্ত্বগুলির কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

ক্যাথলিকদের বিশ্বকোষে উক্ত কথাগুলো থাকায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় একটু অসুবিধায় পড়েছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকে একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে যে, কোরআন শরীফ একজন মানুষের লেখা অথবা একজন মানুষের কথা।

কিন্তু আমরা জানি যে, রাসূলে খোদার কথকতা হচ্ছে হাদীস এবং হাদীসের ভাষা হচ্ছে রাসূলে খোদার নিজস্ব ভাষা এবং এ ভাষার সঙ্গে কোরআনের ভাষার মিল নেই। কোরআনের ভাষা একটা বিস্ময়কর অলৌকিক নির্মিতি যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন ভাষা পৃথিবীতে কোথাও নেই। কোরআন শরীফে সূরা 'আননিসা'-তে ৮২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন :

'তারা কি কোরআন বুঝবার চেষ্টা করবে না? যদি এ গ্রন্থটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে আসত তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য এবং অসামঞ্জস্য খুঁজে পেতো।'

এটা কোরআন শরীফ যখন নাযিল হয় তখন এবং এখনো বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহতায়ালার একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করেছেন। বলেছেন যে, তোমরা যদি পারো তাহলে এর সমতুল্য একটি গ্রন্থ উপস্থিত করো।

'বহু যুগ ধরে খ্রীষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায় কোরআন শরীফের অভ্যন্তরে নানারকম বৈসাদৃশ্য বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কখনো পারেনি। কোন একজন পন্ডিত বিবাহ ব্যাপারে কোরআন শরীফের মধ্যে 'অসামঞ্জস্য' খুঁজে পেয়েছিলো। এক জায়গায় কোনআন শরীফে বলা হয়েছে— 'যদি সকলের জন্য সমান স্বচ্ছন্দ্য না আনতে পারো তবে এক স্ত্রীর বেশি গ্রহণ করো না।'

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে—'চারজনের বেশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না।' একথা দু'টিকে অনেকে স্ববিরোধিতা বলছেন। কিন্তু এ বিচারটি যথার্থ নয়। তার কারণ প্রথম উক্তিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় উক্তিতে ক'জনকে বিয়ে করা যাবে সে বিষয়ে একটা সীমা টেনে দেয়া হয়েছে। উক্তি দুটির মধ্যে বিরোধিতা নেই। কিন্তু বাইবেলে বহু দাবির স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই এবং কোন প্রমাণ নেই। খ্রীষ্টানরা দাবি করেন—'যীশু খ্রীষ্ট আল্লাহ্র সমতুল্য।' কিন্তু তিনি যে আল্লাহর সমতুল্য তার কোন প্রমাণ তারা বাইবেল থেকে দিতে পারে না। খ্রীষ্টানরা কোরআন শরীফ রাসূলে খোদার লেখা এবং তাঁর কথকতা— এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে বলে থাকে—

www.nagorikpathagar.org

'এটা অবশ্য ঠিক যে, কোরআন শরীফ মুহম্মদের লেখা নয়, তাহলে নিশ্চয় এটা শয়তানের লেখা। কেননা এটা তো বাইবেল নয়।' খ্রীষ্টান আচার্যগণের এ সমস্ত উক্তি থেকেই 'স্যাটানিক ভার্সেস' কথাটি এসেছে। এ অভিযোগের উত্তর কোরআন শরীফের সূরা 'আস্‌শুআরা'-তে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন :

'এবং এই অলৌকিক লেখনী কোন পেতাত্মার দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। যখন তারা নিজেদের মতামতের সঙ্গে মিলাতে পারে না তখনই তারা একথা বলে এবং এটা যে মানুষের লেখা একথা প্রমাণ করবার ক্ষমতাও তাদের নেই। মূলত তারা বধির এবং কোরআন শরীফ শ্রবণ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। (২৬:২১০-২১২)

যীশু খ্রীষ্টের জীবনের একটি ঘটনা এখানে আমরা উপস্থিত করতে পারি। ইহুদীরা যীশু খ্রীষ্টকে জানত এবং তাঁর বিরোধিতা করত। শেষ পর্যন্তও তারা বিরোধিতা করেছিল। বাইবেলে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে যীশু খ্রীষ্ট 'ল্যাজারাস' নামক একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করেছিলেন। মৃত ল্যাজারাসকে চারদিন পর কবর থেকে জীবন্ত তোলা হয়। ইহুদীরা এই অলৌকিক ঘটনা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল— 'এ লোকটি যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছে তাতে অতিসত্বরই সাধারণ মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবে। সুতরাং তাকে হত্যা করবার জন্য আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

তখন তারা ঘোষণা করল— 'যীশু হচ্ছে প্রেতসিদ্ধ এবং শয়তানের সাহায্যে সে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে থাকে।'

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের কথা উপস্থিত করে। এটা চিরকাল হয়ে এসেছে। ইহুদীরা যেমন যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্ত করেছে, খ্রিস্টানরাও অবিকল তেমনি কোরআন শরীফকে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বলে ব্যঙ্গ করে থাকে।

ইহুদী খ্রীষ্টানরা কোরআন শরীফের সমালোচনার সূত্রে প্রায়-ই এ অভিযোগ তুলে যে, রাসূলে খোদা ইহুদী এবং খ্রীষ্টান পুরাণ থেকে কোরআন শরীফ নকল করেছেন। এটা যে কোনক্রমেই সত্য নয় তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা উপস্থিত করেছি। কোরআন শরীফে মিশরের এক সম্রাটের কথা বলা হয়েছে যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কোরআন শরীফে তার নাম দেয় হয়েছে 'ফিরাউন'। ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে এবং তাদের পুরাণে 'ফিরাউন' শব্দটি নেই। আছে ফেরাও। এখন এই 'ফেরাও' এবং 'ফিরাউন' কি এক? গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস একজন মিশরীর সম্রাটের কথা বলেছেন যার নাম ছিল ফিরাউন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোরআন শরীফ ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণ থেকে কিছুই নকল করেনি।

খ্রীষ্টানরা বলে থাকেন— 'তেত্রিশ বছর বয়সে যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।'

কিন্তু কোরআন শরীফে বলা হয়েছে—'যীশুখ্রীষ্ট মাতৃক্রোড়ে যখন ছিলেন তখনই তিনি কথা বলেছেন মানুষের কাছে এবং পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি কথা বলে গেছেন।' এটা কোরআন শরীফের আলে ইমরান সূরায় আছে। সুতরাং কোরআন শরীফ যীশু খ্রীষ্টের জীবনধারার ব্যাপারে বাইবেল থেকে কিছুই গ্রহণ করেনি।

ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে রসূলে খোদার আগমনের ইঙ্গিত আছে। অনেক হাজার বছর ধরে প্রচলিত পারসিকদের ধর্মগ্রন্থে একটা বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখটা নিম্নরূপ :

'যখন পারসিকরা নীতি এবং আদর্শ বঞ্চিত হবে তখন আরবদেশে এমন মানুষের জন্ম

www.nagorikpathagar.org

হবে যার অনুসারীরা পারসীকদের সিংহাসন, ধর্ম এবং সবকিছু বিনষ্ট করবে। যে গৃহে অনেক মূর্তি রক্ষিত ছিল সে মূর্তিগুলো ফেলে দেয়া হবে এবং লোকেরা এই গৃহের দিকে মুখ করে তাদের উপাসনা করবে। তার অনুসারীরা ফারস, এনতাউস এবং বালখ্ দখল করবে এবং আশেপাশের আরো অঞ্চল দখল করবে। পারস্যের বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী তাকে অনুসরণ করবে।'

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, এই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যি হয়েছিল। যে গৃহের কথা বলা হয়েছে সে গৃহ হচ্ছে কাবা এবং যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে ব্যক্তি হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)।

বাইবেলে 'ডিউটারোনোমি'র অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা হযরত মুসা (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যৎ-বাণী পাচ্ছি। তিনি বলছেন—'আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইসরাইলীদের মধ্য থেকে মুসার মতো একজন নতুন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করবে।'

খ্রীষ্টানরা এই উক্তির মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের আগমনের উল্লেখ খুঁজে পায়। কিন্তু এটা সত্য নয়। তার কারণ যীশু খ্রীষ্ট কোনক্রমেই হযরত মুসা (আঃ)-এর মতো ছিলেন না। যীশু খ্রীষ্টের পিতা ছিল না, স্ত্রী ছিল না, সন্তানাদি ছিল না। তিনি মুসার মতো বৃদ্ধ বয়সে মারা যাননি এবং তিনি তাঁর জীবিতকালে কোন জাতির নেতৃত্ব দিতে পারেননি। মুসার জীবনে এ সবকয়টি ছিল এবং রাসূলে খোদার জীবনেও এ সবকয়টি আমরা পাই। সুতরাং হযরত মুসা (আঃ) যে নবীর আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন তিনি যীশুখ্রীষ্ট নয়, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

বাইবেলের 'এ্যাক্টস' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে— 'পিটার জনতার সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে বলছেন, যীশু খ্রিষ্টকে ঊর্ধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি স্বর্গেই অবস্থান করছেন। তিনি সেখানেই থাকবেন যতদিন না বিধাতা মুসার মতো একজনকে ইসরাইলীদের মধ্যে থেকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেন।'

একথায় এটা সুস্পষ্ট যে, যীশুখ্রীষ্ট একদিন প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু তখনই প্রত্যাবর্তন করবেন যখন মুসার মতো একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন।

খ্রীষ্টানরা বলে থাকে, যীশুখ্রীষ্ট একজন প্যারাক্লিটের আগমনের কথা বলেছেন। এই প্যারাক্লিট যে কি তা আমরা জানি না। খ্রীষ্টানরা বলে থাকে, এই প্যারাক্লিট কোন মানুষ নয়, এ হচ্ছে একটি স্পিরিট বা আত্মা। কিন্তু তাদের এ বিচার সত্য নয়। তার কারণ যীশু খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে বলেছেন— 'প্রভু তোমাদের নিকট আমার মতই একজনকে পাঠাবেন।' এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে, আত্মার কথা বলা হয়নি। গ্রীক ভাষায় 'একই রকম' এবং 'অন্য রকম' এ দুটির জন্য দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে 'Aloes' অপরটি হচ্ছে 'Heteroes। গ্রীক বাইবেলে দেখা যায়, যীশু খ্রীষ্ট 'Alees' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তিনি প্যারাক্লিট বলে যাঁর কথা বলেছেন তিনি হচ্ছেন রাসূলে খোদা স্বয়ং।

কোরআন শরীফে সূরা আল-আরাফে ১৫৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন : 'তৌরাত এবং পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে যে উম্মী পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে তাঁকে যারা অনুসরণ করবে তারাই ত্রাণ পাবে।'

এভাবেই আমরা কোরআন শরীফের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সাহায্যে এ অমোঘ বাণী যে মহান প্রভু আল্লাহর তা প্রমাণ করতে পারি এবং তাঁর নির্ধারিত শুদ্ধতম ধর্ম যে ইসলাম তা-ও প্রমাণিত। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

সূফী মতবাদ এবং মানুষের অন্তর্লীন সত্তার রহস্য

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা একই সঙ্গে নিজেকে 'আল জাহির' এবং 'আল বাতিন' বলেছেন। আল জাহির হচ্ছে যা উন্মুক্ত এবং প্রকাশ্য এবং আল বাতিন হচ্ছে যা অভ্যন্তরীণ এবং অন্তর্লীন। এ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা এখানে যা কিছু দেখি সবই হচ্ছে মহান প্রভুর নামের এবং গুণাবলীর ছায়া এবং প্রতিবিম্ব। পৃথিবীর সকল বাস্তবতার একটি বহিঃপ্রকাশ আছে এবং একটি অন্তর্লীন সত্তা আছে যা আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় অথবা যে সমস্ত রূপকল্প আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভাসে সেগুলো নিছক মায়া নয়; এগুলোর প্রতিটির আপনাপন সত্তা-সূত্রে একেকটি বাস্তবতা আছে। প্রত্যেকটা বস্তুর একটি অন্তর্লীন কেন্দ্রবিন্দু আছে যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকৃতির একটি দৃশ্যগোচরতা ঘটে। আমরা এই যে বহির্গত বাস্তবতারই অভ্যর্থনায় পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছি কিন্তু একে নিয়েই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি তাহলে যথার্থ সত্যকে পাব না। কেননা, বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে যাত্রার মধ্য দিয়েই আমরা সৃষ্টির মূল সত্যে উপনীত হতে পারি।

সূফী তত্ত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অন্তর্লীন সত্তার রহস্য উদঘাটন করা। মানব সত্তার অভ্যন্তরে যে সত্য নিহিত রয়েছে তাকে উদঘাটন করাই হলো সূফী সাধনার দায়িত্ব। মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলেছেন :

"লাকাদ্ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবিম। সুম্মা রাদাদনাহু আসফালাহ্ সাফেলীন" অর্থাৎ যথার্থই আমরা মানুষকে মহোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছি, পরবর্তীতে আমরা তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি। (৯৫:৪-৫)

আল্লাহ্ তায়ালার এই উক্তিতে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানের কথা অনুধাবন করা যায়। এটাই হচ্ছে মানুষের সর্বকালীন রূপ। যে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আপন গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তার মধ্যে মহত্ত্ব আরোপ করেছেন সে মানুষই আবার আল্লাহ্র ঐশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পার্থিব কর্ম-পরম্পরায় দীনতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কোরআন শরীফের কথায় মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তাটাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য যাকে বলা হচ্ছে 'আহসানে তাকবিম'। পৃথিবীতে যতই বিবর্তন আসুক এবং প্রতিদিনের প্রাত্যাহিকতায় অনবরত যতই পরিবর্তন আসুক, মানুষের এই মহোত্তম সত্তা কখনই ধ্বংস হয় না। যখন মানুষ পংকিলতার আবর্তে নিমগ্ন হয় তখন সে তার মহোত্তম সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ বিচ্ছিন্নতাটি সাময়িক। বিভিন্ন কারণে এ বিচ্ছিন্নতা ঘটে। পার্থিব কর্মের মোহগ্রস্ততায় ঘটে, ইচ্ছাশক্তির অভাবের কারণে ঘটে, শিক্ষার বিপর্যয়ে ঘটে এবং পরিবেশের প্রভাবে ঘটে, কিন্তু মানুষের মূলীভূত সত্তা কখনও বিলুপ্ত হয় না।

একজন সূফী সাধক বলেছেন— 'কখনও ভেব না তুমি যখন চলে যাবে তখন পৃথিবীও চলে যাবে।'

এক হাজার মোমবাতি জ্বলে নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু সূফীদের সাধনাবৃত্ত এখনও অক্ষুণ্ন আছে। নবম হিজরীতে কামাল উদ্দিন হুসাইন কাশেফী নামক এক সূফী ব্যাখ্যাকার 'আহসানে তাকবিম' কথাটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— 'আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সর্বতোভাবে পূর্ণকায় এবং পরিপূর্ণ দিব্যরূপে সৃষ্টি করেছেন যেন সে আল্লাহর অধিকার এবং আমানতকে বহন করতে সক্ষম হয়।'

www.nagorikpathagar.org

তিনি 'আসফালা সাফিলিন'-এর ব্যাখ্যা করে বলেন— 'পৃথিবীতে স্বাভাবিক যে কামনা-বাসনা আছে এবং যে নীতিভ্রষ্টতা আছে তার কারণেই মানুষের অবনতি ঘটে।'

মানুষ আল্লাহ্'র পবিত্রতমরূপে সৃষ্ট হয়েছে। রাসূলে খোদা মানুষের রূপ সম্পর্কে বলেছেন— 'খালাকাল, লাহা আদাম আলা সূরাতিহি অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে তাঁর নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ পৃথিবীতে তার এই সহজাত পূর্ণতা থেকে পার্থিব আকর্ষণের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলেও তার অন্তর্লীন সত্যরূপ বিনষ্ট হয় না। সূফীরা মানুষের এই অন্তর্লীন সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেন এবং মানুষকে এ সত্যটি অনুভব করতে সাহায্য করেন যে, সে মূলত আল্লাহর গুণে গুণান্বিত এবং সে গুণগুলো তাকে খুঁজে পেতেই হবে।

মানুষের অস্তিত্বের একটা বিরাট মহত্ত্ব আছে। অথবা বলা যায়, একটি বিরাট চমৎকারিত্ব আছে। মনুষ্য স্বভাবের সম্ভাবনা অনেক এবং বিপদাপন্ন হওয়ার সুযোগও অনেক। বৃহৎকে পাবার, ভূমাকে পাবার এবং আল্লাহর গুণাবলীকে আয়ত্ত করবার ক্ষমতা মানুষের অস্তিত্বে আছে। সৃষ্টির পর আদম যদি বেহেশতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং পবিত্র পরিবেশে সময় ক্ষেপণ করতেন তাহলে তার জন্য কোন সমস্যা থাকত না। সে অবস্থায় শুধু একীভূত হওয়ার আনন্দ ছিল, বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর আবহে অনেক ধ্বংস এবং অনেক অসদ্ভাবের মধ্যে নিপতিত হয়েছে যার ফলে তার মৌলিক সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ সত্তাকে অবমুক্ত করার দায়িত্বের কথা সূফীরা বলেছেন।

পৃথিবীতে কর্মের দায়ভাগ থাকবে, উৎপাদনের পরিক্রম থাকবে, ক্রোধের সুযোগ থাকবে, বিনয়ের অভাব থাকবে, অস্বাচ্ছন্দ্যের উল্লাস থাকবে, এগুলো মানুষকে প্রহরে প্রহরে অসুবিধার মধ্যে ফেলবে যার ফলে মানুষ তার পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর জীবনে একটি সীমাবদ্ধতা আছে, একটি নিয়ন্ত্রিত রূপ আছে এবং একটি শান্ত তাৎপর্য আছে। এসবের কারণে মানুষ বিধাতার অসীম যে বাস্তবতা, সে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে আসে।

পৃথিবীতে মানুষের একটি শরীরী সত্তা আছে এবং এ সত্তার একটি প্রবৃত্তিগত দাহিকাশক্তি আছে। এ দাহিকাশক্তি মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এবং তাকে বিধাতার অফুরন্ত অনন্ত বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষ তখন পৃথিবীর জীব হিসেবে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। এ সকল সীমা অতিক্রম করে অলৌকিককে পাবার ইচ্ছা তার বিনষ্ট হয়ে যায়, তার ফলেই সে 'আসফালা সাফেলিন' হয়।

পৃথিবীতে প্রাণের স্ফূর্তিতে অনেক রূপই ঘটেছে— জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, মৎস্যকুল এবং বৃক্ষরাজি সব কিছুরই প্রাণ আছে, কিন্তু এ সমস্ত কিছুর মধ্যে অন্তর্গূঢ় কোন জীবসত্তার বিনিঃশেষ থাকলেও মানুষের বিনিঃশেষ নেই। কোন প্রাণী তার প্রকাশ্য সত্তার সীমা অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু এই সীমা অতিক্রমের ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ বলতে 'উম্মাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'উম্মাহ' অর্থটা কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের অস্তিত্বকে বোঝায় না, এ শব্দের সাহায্যে আমরা সেই সব মানুষকে বুঝি যারা পবিত্রতম শব্দের উদঘাটনের সাহায্যে স্বর্গে প্রবেশের অধিকারী হয়েছে। মানুষ অনুভব করে না যে, একটি অনন্ত সত্তা বা 'আযল' থেকে তার জন্ম। তার কারণ পার্থিব

www.nagorikpathagar.org

কর্ম-ব্যবস্থাপনায় সে অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এই অনন্তবোধকে অনুসন্ধান করতে হবে এবং আমাদের অস্তিত্বের দায়ভাগে তাকে নিয়ে আসতে হবে।

পৃথিবীর একটি মোহনীয় নিয়ন্ত্রণ আছে, এ নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষ সত্যের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

পৃথিবী কখনও আল্লাহর সাক্ষ্য থেকে বিচ্যুত থাকবে না, পৃথিবীর জন্য পরিপূর্ণ শূন্যতা নেই, কেননা পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার একটি বিকাশ—'লা খালকুল আরদ আন উজ্জাতুল্লাহ'। অনন্তের জন্য মানুষের কামনা এবং অনন্তের অন্বেষণে মানুষের ধাবিত হওয়ার একটি বিশেষ অর্থ আছে, তা হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ্‌র মহিমায় সৃষ্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাস করলেও মানুষ তার নিজস্ব প্রবণতায় সে মহিমাকে আবিষ্কার করতে ব্যাকুল হয়। মানুষ তার সীমাবদ্ধ অবস্থিতি এ কারণে সহ্য করে যে, তার অনুভূতি তাকে বলে, তার জন্য একটি মহান পূর্ণতা আছে। যে মহান পূর্ণতা লাভ করা তখনই সম্ভব যখন সে তার অন্তর্লীন সত্য-সত্তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। এই অন্বেষণ মানুষের কখনও শেষ হবে না এবং এ বিশ্বাস থেকে মানুষকে কখনও সরিয়ে আনা যাবে না যে তার একটি অনন্ত জীবন আছে। পৃথিবীর জীবনীটি বৃক্ষলতার জন্য, কীট-পতঙ্গ, প্রাণীকুলের জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবন। এগুলোর বিনিঃশেষ আছে, কিন্তু মানুষের অনুভূতির সত্যবোধের এবং উপলব্ধির বিনিঃশেষ নেই। সূফীদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় এ প্রশ্নটি বারবার উত্থাপিত হয়, এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের কারণটি কি? যদি জন্মলাভের উদ্দেশ্যই হয় মৃত্যুতে বিনিঃশেষ হওয়া তাহলে এই জন্মলাভের সার্থকতা কোথায়? সূফীরা বলেন— 'পৃথিবীতে জন্মলাভ এবং জীবন যাপন হচ্ছে একটি পরীক্ষা এবং একটি সাধনা। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ তার অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবে এবং অস্তিত্বের অঙ্গীকারকে প্রকাশ করবে। মানুষ যখন তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে সক্ষম হবে তখন একটি বিরাট রহস্য উদঘাটনের মধ্যে দিয়ে সে উপলব্ধি করবে, সে একটি বিরাটের অংশ এবং যে বিরাট হচ্ছে মহান প্রভু মহিমাময় আল্লাহর বিরাটত্ব, সর্বব্যাপকতা, সর্বকালীনতা এবং অনন্ত মাধুর্য। মানুষের উৎপত্তি-তত্ত্বের মধ্যে বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে তার সম্পর্কের একটি পরিণতি রয়েছে।'

শেখ মাহদুদ শাবিস্তারী নামক একজন সূফী সাধক তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন— 'যার আত্মা স্বর্গসুখের আস্বাদন পায় পৃথিবী তার কাছে একটি মহান সত্যের গ্রন্থ। আকস্মিক ঘটনাবলী হচ্ছে তার স্বরবর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হচ্ছে তার ব্যঞ্জনবর্ণ এবং সৃষ্ট পদার্থের বিভিন্ন স্বরূপ হচ্ছে তার ছন্দ এবং বিরাম চিহ্ন।' এর অর্থ হচ্ছে, যে পৃথিবী মানুষ পেয়েছে সে পৃথিবীর মধ্যে থেকে মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করবে এবং মহৎকে আবিষ্কার করবে।

আরও একটু সুস্পষ্টভাবে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী বলেছেন— 'যে মুহূর্তেই এই নিম্নমানের পৃথিবী তোমাকে দেয়া হয় সে মুহূর্তেই তার নিকটে একটি সিঁড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যে সিঁড়ি পেয়ে তুমি অনন্তকে স্পর্শ করতে পার।' অর্থাৎ মানুষকে তার যথার্থ পরিত্রাণের জন্য উর্ধলোকে উঠতে হবে। এই উর্ধলোকটি এক ধরনের সৃষ্টিগত রূপান্তরমাত্র, একটি মহান বাস্তব যা আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবের অনেক উর্ধ্বে। দার্শনিক পরিভাষায় একে বলা হয় ম্যাটাকজমিক রিয়ালিটি'।

যেহেতু মানুষকে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে হলে তার অন্তর্লীন সত্তার চৈতন্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, তাই মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষকের— যিনি পর্যায়ক্রমে মানুষকে তার অহংবোধ থেকে মুক্ত করে সত্যবোধে উপনীত করবেন। সূফী সাধকরা এই

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষকের কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর যে সমস্ত মানুষ কোরআন শরীফের ধর্মকে যুগ যুগ ধরে অবলম্বন করে আছেন তাদের আত্মার অধিকারের জন্য এবং পার্থিব সংকল্প থেকে পরিত্রাণের জন্য সূফী সাধকরা এগিয়ে আসেন। এভাবে সূফী সাধনা ইসলামের অন্তর্গত একটি সাধনা। কোরআন শরীফের যথার্থ উপলব্ধির জন্য যে আত্মিক অনুভূতি এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সূফীরা সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এ ধারণার মূল কথা হচ্ছে তৌহিদকে উপলব্ধি করা। আল্লাহর এই তৌহিদকে উপলব্ধি করতে হলে অনন্ত রহস্যের প্রেক্ষাপটে তা করতে হবে।

কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা একটি চুক্তির কথা বারবার বলেছেন, যে চুক্তির কারণে তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই চুক্তির দায়বদ্ধতা মানুষের রয়েছে, কিন্তু মানুষ এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় না। এই চুক্তিটি অপার রহস্যময় যাকে বলা হয় 'আসরার-ই আলাস্তু'। সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে এই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং চুক্তির কারণে মানুষের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালনে মানুষকে সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ রাখা। বারবার মানুষকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তার একটি বিশেষ অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্ব তার প্রত্যাহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত নেই, তার অহংবোধের যে বন্ধনদশা আছে তা থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে।

সূফীদের মূল আবেদন হচ্ছে মানুষের চিত্তের অভ্যন্তরে অন্তর্লীন স্বভাবের কাছে। সূফীরা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন যে, তার অভ্যন্তরস্থ সত্তার কি প্রয়োজন। তারা বহির্জগতের আশ্লেষ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর স্বভাবে নিষিক্ত করতে চান। এভাবে মানুষ যখন আল্লাহর স্বভাবের সঙ্গে মিশে যাবে তখন তার আর কোন কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয় থাকবে না।

হাফিজ বলেছেন—'বহু বৎসর আমাদের হৃদয় আমাদের কাছ থেকে জাম-ই-জাম অর্থাৎ জামশিদের পানপাত্র দাবি করছিল। কিন্তু সে জানত না যে, এ পাত্রটি অপরিচিত লোকের কাছে পাওয়া যাবে না। এ পাত্রটি আমাদের চিত্তেই রয়েছে। জামশিদের পানপাত্র পেতে হলে মানুষকে পার্থিব কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে।'

উক্ত কথাই আবুল ইয়াজিদ বোস্তমী একটু অন্যভাবে বলেছেন— 'আমি পৃথিবীকে অস্বীকার করি। মহান একাকীর সামনে দাঁড়ালাম, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, ওহে আমার প্রভু, আমি আর কাউকে চাই না, আমি শুধু তোমাকেই চাই, যখন আমি তোমাকে পাব তখন আমি সব কিছুকেই পাব।'

ফরিদ উদ্দীন আত্তার বলেছেন— 'যখন আল্লাহ্ আমার আন্তরিকতাকে স্বীকার করলেন তখন তিনি অশেষ করুণায় আমার অস্তিত্ব থেকে আমার অহং-এর আবরণ সরিয়ে দিলেন।'

সূফী সাধনায় দুটি তত্ত্ব খুবই প্রবল। এ দুটি হচ্ছে— 'ওহাদাত আল ওজূত' এবং 'আল ইনসাল আল কামিল'। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে অস্তিত্বের এমন একটি একত্ব যা লৌকিক অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে, এক অর্থে যা নির্জ্ঞেয় এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে পূর্ণকাম মনুষ্য সত্তা।

আমরা জানি, পৃথিবীতে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুরই চিরকালের অস্তিত্ব নেই। একমাত্র মহান প্রভু চিরকাল আছেন, তাঁর একক অস্তিত্বই একটি চিরকালীন অস্তিত্ব। এই পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সৃষ্ট জীব যে অনন্তের অধিকার পেতে পারে, অন্য কোন জীবের

www.nagorikpathagar.org

যে সম্ভাবনা নেই, মানুষের সে সম্ভাবনা আছে। মানুষ হচ্ছে দর্পণের মতো যেখানে আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হয়। একথাই সাধক লালন শাহ্ তাঁর একটি সাধন সঙ্গীতে বলেছিলেন। তিনি একটি দর্পণের কথা বলেছেন যার নাম দিয়েছেন আরশীনগর, যেখানে একজনের প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। সে প্রতিবিম্ব এক অর্থে মানুষেরই উর্ধ্বতন সত্তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু মানুষ পার্থিব বন্ধনের বিভ্রান্তিতে কিছুই দেখতে পায় না। সূফীদের বক্তব্য হচ্ছে, মানুষের অন্তর্লীন মহৎরূপের মধ্যে বিধাতা যেন নিজেকেই অনুভব করেন।

ইসলাম হচ্ছে তৌহিদ বা একত্ববাদের ধর্ম এবং ইসলামের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুশাসনে তৌহিদের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। যাকে আমরা 'শরীয়া' বলি তা হচ্ছে বিভিন্ন অনুশাসন এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার রীতিপ্রকরণ, যা একজন বিশ্বাসীকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শরীয়াতের নির্দেশনাবলীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের অন্তঃস্বরকে আবিষ্কার করা এবং সকল অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে মহান প্রভুর যে ইচ্ছা রয়েছে সে ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হওয়া। শরীয়াত সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর কোন আচরণবিধি নয়, শরীয়াত হচ্ছে নিগূঢ়ভাবে আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করার পদ্ধতি। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা বলেছেন— 'দৃশ্যমান শরীয়াত পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের যথার্থ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না, যথার্থ বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের গভীরের একটি বিশ্বাস।'

শরীয়াতের বিভিন্ন দায়দায়িত্ব মানুষের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এ দায়দায়িত্ব যাতে নিছক আচরণবিধিতে পরিণত না হয় সে জন্য সূফী সাধকরা আত্ম-উপলব্ধির কথা বারবার বলেছেন। ইনসান-এ-কামিল হতে হলে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে।

বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য চিৎপ্রকর্ষের সাধনা কখনই সম্ভবপর হয় না, যদি না পথপ্রদর্শক থাকে। সূফীরাও একই কথা বলেন। একজন সূফী শিক্ষক যাকে আমরা শেখ বা পীর বলি তিনি আল্লাহ্‌র অপার করুণার যে বিকাশ আমাদের পয়গম্বরের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সেই আভ্যন্তরীণ কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করেন। সূফীদের এই সাধনাকে 'তরীকাহ্' বলা হয়। তরীকাহ্ শরীয়াহ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরঞ্চ শরীয়াহ্'র অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য তরীকাহ-র মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক চেতনলোকে পৌঁছতে হলে তরীকাহ্ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। তবে সকলেই যে তরীকাহ অবলম্বন করবে তা অবশ্য সম্ভবপর নয়। যারা অনন্ত সত্যের রহস্য-সন্ধানী এবং কোরআন শরীফের উৎসমূলে উপনীত হওয়ার আগ্রহী, তারাই কেবল তরীকাহ্ অবলম্বন করে থাকেন।

সূফীরা বলে থাকেন এই তরীকাহ-র ধারা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে সিলসিলারূপে এসেছে। এক্ষেত্রে মহানবীর বংশধরগণের প্রথম কয়েকজন ইমামের ধারাক্রমের কথাও বলা হয়ে থাকে, যেমন উম্মে হাবিবা, হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম মূসা কাজিম, ইমাম আলী রেজা প্রমুখ। এভাবে রাসূলের বংশধারার মধ্য দিয়ে ক্রমশ তরীকাহ্ সকলের মধ্যে ছড়িয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মুক্তির জন্য মহানবীর যে বারাকাহ বা আশীর্বাদ ছিল সে আশীর্বাদের ধারা পীরপরম্পরাগতভাবে মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে। যাকে আমরা পীর বলি তিনিই 'শেখ' অথবা 'মুর্শিদ' অথবা 'মুরাদ'।

মাওলানা রুমী বলেছেন—'আমি নিদারুণ যন্ত্রণায় বৃদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু যখন আপনার নাম, হে তাবরীজ, আমি উচ্চারণ করলাম তখন আমার সমগ্র যৌবন ফিরে এলো।' সূফী সাধনায় এটাকেই বলা হয় যৌবনময় হওয়া। একজন মুর্শিদ তার শিষ্য বা মুরীদকে অনন্ত

www.nagorikpathagar.org

জীবনের উৎসমূলে নিয়ে আসেন এবং এভাবে অনন্ত জীবনকে স্পর্শ করার সাহস থেকে একজন মুরীদ যৌবনময় হয়। যিনি পীর বা মুর্শিদ কখনও তাকে 'কুতুব' অর্থাৎ আত্মিক দণ্ড, আবার কখনও বলা হয় 'রেজালুল গায়েব' অর্থাৎ অদৃশ্য ধারাবাহিকতার অধিকারী। একজন সূফীর দায়িত্ব হচ্ছে 'আল হক' বা সত্যের ধারাবাহিকতার অধিকারী। একজন সূফীর দায়িত্ব হচ্ছে 'আল হক' বা সত্যের ধারাক্রমকে গ্রহণ করে মহান আল্লাহর রহমাহ্ বা করুণা পাবার পথ সৃষ্টি করা। একজন সূফী শেখ হচ্ছেন একটি দরজার মতো। 'প্রিয়তমার উদ্যানে' প্রবেশ করতে হলে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী তাঁর পীর বা মুর্শিদ শামস তাবরীজের সামনে নিজেকে ফকির বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফকির হচ্ছে শিষ্য বা মুরীদ। তিনি বলেছেন—'যদি শামস তাবরীজ তোমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে আসেন তাহলে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হবে এবং একটি আলোর বৃত্তের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত দেখবে।'

তিনি আরো বলেছেন—'সমস্ত মানুষ যখন রাত্রির অন্ধকার তখন পীর হচ্ছে চন্দ্রের আলো।'

রিজাল বা পরিপূর্ণতার অবস্থানে উপনীত হতে হলে শেখের বা মুরাদের অকৃত্রিম সাহায্য প্রয়োজন। মাওলানা রুমী আরও বলেছেন— 'তোমাকে যাত্রা করতে হবে অস্তিত্বের বাইরে থেকে অস্তিত্বের অভ্যন্তরে। কেননা এ ধরনের যাত্রায় পৃথিবী স্বর্গের ঔজ্জ্বল্য পায়। তোমাকে যাত্রা করতে হবে তিক্ততা এবং বিষাদ থেকে মধুরতার পথে। তখন দেখবে যে লবণাক্ত মৃত্তিকা থেকেও ফলবান বৃক্ষের উদগম ঘটেছে। তাবরীজের গৌরবসূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ, পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষ সূর্যের আলোতে সুন্দর হয়েছে।'

মনসুর হাল্লাজের কাহিনী আমরা জানি। তিনি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং পরম পুরুষের অস্তিত্বে নিজেকে অভিন্ন ভেবেছিলেন। সাধনার এই চরম উৎকর্ষ খুব কম সাধকই লাভ করতে পারেন। তিনি বলেছেন— 'যে গোপন সত্য বহুদিন পর্যন্ত তোমার নিকট লুক্কায়িত ছিল সে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। একটি অভিনব উদ্ভাসনে তুমি এখন আলোকিত হয়েছো— যা তুমি একসময় অজ্ঞাত ছিলে। তুমি হচ্ছো একটি আবরণের মতো যা চিত্তকে মহান প্রভুর রহস্য থেকে আড়াল করেছিল। যে মুহূর্তে তুমি তোমার চিত্ত থেকে সরে আসবে সে মুহূর্তে তিনি সেখানে আসন নেবেন এবং তখন একটি অলৌকিক বর্ণনা আরম্ভ হবে যা কখনও মানুষকে ক্লান্ত করবে না এবং যার গদ্য এবং পদবন্ধ চিরকালের জন্য আকর্ষণীয় হবে।'

ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'এহিয়া উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে বলছেন— 'ধর্মীয় সাধনার অবস্থানগুলো মোটামুটি তিনটি— ঐশ্বরিক জ্ঞান, আত্মার আহওয়াল বা অবস্থা এবং কর্ম। যেটি চিরস্থায়ী নয় সেটি হচ্ছে হাল বা অবস্থা। কিন্তু মোকাম হচ্ছে চিরস্থায়ী, যেখানে মানুষ আল্লাহর পথে উপস্থিত হয়। মানুষ পরিশ্রম করে মোকামাতে উপস্থিত হয়। এ পরিশ্রম হচ্ছে আল্লাহর সংকল্প সাধন।'

পঞ্চম হিজরীর বিখ্যাত সূফী সাধক আবু সাঈদ ইবনে আবীল খায়ের সূফী সাধনার চল্লিশটি অবস্থার কথা বলেছেন। মাকামাতে আলাবাইন এই মাকামাগুলো হচ্ছে নিয়ত বা উদ্দেশ্য, ইনাবাত বা পরিবর্তন, তাওবাত বা অনুতাপ, ইরাদাত বা শৃঙ্খলা, মজাহাদাত বা আত্মিক সংঘাত, মুরাকাবাত বা সার্বক্ষণিক মনোযোগ, সবর বা ধৈর্য, জিকির বা আহ্বান, রিদাহ্ বা তৃপ্তি এবং এভাবে বিভিন্ন নামে ৪০টি মোকামের উল্লেখ আমরা পাই। যথার্থ

www.nagorikpathagar.org

সাধককে এ সবকটি মোকামকে অধিকার করতে হবে এবং তাহলে তিনি সৌভাগ্যবান হবেন। সর্বশেষ মোকাম হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হওয়া। বৌদ্ধ মতবাদে যাকে 'অবলোকিতেশ্বর' বলা হয় সে অবলোকিতেশ্বর হচ্ছে বুদ্ধের একটি প্রকাশ, যা নির্বাণে পা রেখেছে।

সূফী সাধকগণ শান্তির অনুসন্ধান করেন। এ শান্তি হচ্ছে চিত্তের অভ্যন্তরীণ শান্তি। এভাবে শান্তি লাভ করার পর একজন সূফী তার ঔদার্যের বাহু বাড়িয়ে দেন সকল মানবসত্তাকে শান্তির নীড়ে নিয়ে আসবার জন্য। সূফী সাধনা সেই অর্থে শান্তির অন্বেষণ।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে একটি মহোত্তম স্থানে উপনীত করে। ইসলাম একটি মহোত্তম উপলব্ধি, যে উপলব্ধি পার্থিব কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানুষকে নির্গুণ মাহাত্ম্যে উপস্থিত করে। এ মাহাত্ম্য মানুষ যখন আবিষ্কার করবে তখন তার চিত্তে আনন্দ ও শান্তি আসবে। পবিত্রতার মধ্যদিয়ে, পরিচ্ছন্নতার মধ্যদিয়ে এবং বিনম্র ধ্যান-সাধনার মাধ্য দিয়ে মানুষ এ পৃথিবীতে স্বর্গের উদ্যানের শান্তির আস্বাদন পায়। সূফী মতবাদ মূলত মানুষের মধ্যে এই শান্তি এবং আনন্দ এনে দেয়ার প্রচেষ্টা।

পৃথিবীর কর্ম-বন্ধন থেকে মানুষ নিজেকে প্রত্যাহার করবে এ কথা কিন্তু ইসলাম বলে না। ইসলাম আসক্তি থেকে মুক্ত হতে বলে। অর্থাৎ তিনিই যথার্থ মুসলমান যিনি আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিতে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন, কিন্তু লৌকিক কর্মসাধনায় পরিচ্ছন্নভাবে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) একবার বলেছিলেন— 'প্রত্যেক কাজের জন্য মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময় গ্রহণ করবে। তার কর্মের জন্য, সংসারের জন্য, শরীরের জন্য এবং আল্লাহর জন্য। সকল সময়ই যেহেতু আল্লাহর, সুতরাং মানুষ তার পার্থিব কর্ম সম্পাদনে আল্লাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। এই চিন্তাটি প্রকাশ পায় পবিত্রতার মধ্যে, পরিচ্ছন্নতার মধ্যে এবং পরিশুদ্ধতার মধ্যে।

বিঃদ্রঃ— আমি এই প্রবন্ধ লেখার সময় বিখ্যাত ইরানী পণ্ডিত সৈয়দ হোসাইনী নাসেরের 'লিভিং সূফীজম' গ্রন্থ থেকে বহুল সাহায্য নিয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর অস্তিত্বের অনন্যতা

আমরা প্রত্যক্ষে যা দেখি, তাই তো শুধু অস্তিত্ব নয়, যেটা অনুভব করি সেটাও অস্তিত্ব। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমাবন্ধন আছে। আমাদের দৃষ্টিপাতের একটি সমাপ্তি বিন্দু আছে। সুতরাং দৃষ্টির গোচরে যা আসছে তাই যে শুধু সত্য তা নয়, আমাদের দৃষ্টির অধিকারের বাইরেও অস্তিত্বের বিস্তার রয়েছে, যেটাকে আমরা মেনে নেই দৃষ্টিগত যুক্তির সাহায্যে। যেহেতু দৃষ্টি কতগুলো রং এবং রেখার চিহ্নিতকরণ করে। সুতরাং আমরা দৃষ্টির বাইরেও একই প্রকৃতির রং এবং রেখা যে থাকবে তা আমরা মেনে নেই। সবুজে আকীর্ণ বনভূমি শুধু আমার দৃষ্টির সীমায় যে আছে তা নয়, আমার দৃষ্টির বাইরেও তা আছে। সমুদ্রের বিক্ষুব্ধতা যা আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেই বিক্ষুব্ধতা সকল সমুদ্রেই আছে এটা আমরা মানি। যে রহস্য আমাদের নয়নের সম্মুখে উদঘাটিত হচ্ছে তা শুধু এক অঞ্চলের জন্য সত্য তা নয়, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জন্যই সত্য। সুতরাং যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার কিছুটা দৃষ্টির গোচরে থাকে, কিছুটা অগোচরে। গোচরীভূত সত্তার যুক্তির সাহায্যে আমরা অগোচরকেও মান্য করি।

ঠিক একইভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমার দৃষ্টির পৃথিবী এ মুহর্তের তাৎক্ষণিক পৃথিবী নয়। এ পৃথিবী এখন যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এর রূপের পরিবর্তন হতে পারে অথবা আকৃতির, কিন্তু এর অস্তিত্বের পরিবর্তন হয়নি, হবে না। হয়তো অস্তিত্বের পরিবর্তন হবে, কিন্তু পৃথিবীর মৌল কাঠামোটা ঠিকই থাকবে। এভাবে শুধু দৃষ্টির সাহায্যে যে অস্তিত্বের বিচার সে বিচারের অনেক আড়াল আছে, অনেক অনিশ্চয়তা আছে এবং অনেক অজানা রহস্য আছে।

সরহপা তাঁর দোহাকোষে অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন— 'সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘ হয়ে ভাসে, আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হয়ে সমুদ্রে মিশে যায়।' এ উক্তির সাহায্যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, অস্তিত্ব একই, তার হয়তো রূপান্তর আছে, কিন্তু মূলত তা একই সত্তায় দ্রবীভূত।

একজন শিল্পী দৃষ্টির অধিকারকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি বলে থাকেন, আমি ছোটই দেখি আর বড়ই দেখি, আমি যা দেখি তা একই অস্তিত্বের প্রকারভেদ মাত্র। তাই একজন শিল্পী তার দৃষ্টির শেষ সীমা চিহ্নিত করেন এবং উর্ধ্ব থেকে, অধঃ থেকে এবং চতুষ্পার্শ্ব থেকে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করেন। শিল্পী যখন তাঁর ক্যানভাসে বস্তুর স্বরূপকে চিহ্নিত করতে চান তখন তিনি তার সকল প্রকার দেখাকে একত্রিত করে একটি পরিপূর্ণ দেখার অবয়ব গড়ে তুলতে চান। একটি চিত্রকর্মে যে দৃশ্য পরিস্ফুট হয় তা বাস্তবের দৃষ্টিগোচর সত্যের প্রতীক। মানুষের দৃষ্টি তার নয়ন দুটিতে আবদ্ধ, না মস্তিষ্কের মধ্যে সংস্থিত তা আমরা জানি না। অন্ততপক্ষে সাধারণ মানুষ তা জানে না। কিন্তু নয়ন রুদ্ধ করেও আমরা দেখি, এ দেখাগুলোও আমরা দেখি। তবে প্রত্যক্ষ বাস্তবে নয়, কিন্তু তা মিথ্যাও নয়। তার কারণ প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে তা উদ্ভূত। আমরা দেখতে পাই বলেই দেখার অনুষঙ্গ নির্মাণ করি এবং দৃষ্টিগোচরীভূত বস্তুর প্রতীকও নির্মাণ করি। রুদ্ধ নয়নের কাছে সেই প্রতীকগুলো এসে ধরা দেয় এবং স্বপ্নের মধ্যে সেই প্রতীকেরই অভিযাত্রা দেখি।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং আমরা দৃষ্টির সাহায্যে যে অস্তিত্বকে চিহ্নিত করি তা যে শুধু দৃষ্টির সাহায্যে লভ্য তা নয়, চিন্তার সাহায্যেও তা রূপলাভ এবং দৃশ্যমান হয়।

দৃশ্যমানবতার বাইরেও মানুষের উপলব্ধিগত একটা দিক আছে। আমরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু যা প্রত্যক্ষ করি না, তা-ও যে আছে তা অনুভব করি এবং সে অনুভূতির সাহায্যে তাকে আমরা অস্তিত্বের অন্তর্গত করি। যেমন বাতাস, বাতাস আমরা দেখি না, কিন্তু বাতাস আমাদের অস্তিত্বের অন্তর্গত। বেঁচে আছি বলেই আমরা জানি যে, বাতাস আছে বলেই আমরা আছি। এখানেও সত্যটা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু সত্যটা অনুভবের বস্তু। কোন অস্তিত্ব দেখা যায়, কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। যা দেখা যায় না তা অনুভূতির সাহায্যে আমরা মান্য করি। মানুষের কতকগুলো ইন্দ্রিয় আছে, সেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে দর্শন করে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, স্বাদ গ্রহণ করে, আবার আঘ্রাণ নেয়। এগুলো সবই কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। আমার একটি অস্তিত্ব আছে বলেই আমার দৃষ্টির অনুভূতি আছে, স্পর্শের অনুভূতি আছে। আমি স্পর্শ করে একটি বস্তুর উষ্ণতা এবং শীতলতা অনুভব করতে পারি এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারি। আমি একটি উষ্ণতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, তেমনি শীতলতাকেও কতটা শীতল এবং কতটা উষ্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু উষ্ণতা অথবা শীতলতাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আমরা দাহনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং বরফকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু উষ্ণতা ও শীলতাকে অনুভব করতে হয়। মানুষের এক বিস্ময়কর চেতনালোক আছে, সেই চেতনালোকে যখন সাড়া পড়ে তখন উষ্ণতা ও শীতলতার ব্যাখ্যা আমাদের মনে আসে। তাই প্রত্যক্ষ এলেই একটি বস্তু সত্য হবে তা নয়, অপ্রত্যক্ষেরও সত্যবোধ আছে। সব মানুষ অবশ্য সত্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু যারা সচেতন তারা নির্ভাবনায় বলতে পারেন— 'যা আছে তার সবটাই দৃষ্টিতে নেই, অনেকটা আছে আমার অনুভূতিতে। এই অনুভূতিকে আমি যদি নির্ণয় করতে পারি, তা হলে অস্তিত্বকে আমি নির্ণয় করতে পারব।'

মানুষের আরেকটি অনুভূতি হচ্ছে গন্ধের অনুভূতি। পৃথিবীতে সর্বত্রই নানা প্রকার গন্ধ আছে। শুকনো মাটির গন্ধ আছে, ভেজা মাটির গন্ধ আছে। বাতাস কখনও কখনও অজানা গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। উদ্ভিদ জগতে বিচিত্র গন্ধ আছে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ অনেক রকম। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সে পৃথিবী বিচিত্র এক গন্ধের পৃথিবী।

একজন মানুষ গন্ধের সাহায্যে একটি অস্তিত্বের সাড়া পায়। গন্ধের উৎস অনেক সময় আমরা জানি না, কিন্তু গন্ধকে আমরা পাই রূপহীন, নিঃশ্বাসের মধ্যে। এভাবে দেখা যাবে, অস্তিত্ব এমন এক বস্তু যার রূপ আছে, আবার রূপ নেই, যার আকৃতি আছে, আবার আকৃতি নেই; যার গন্ধ আছে, কিন্তু তার উৎস অনির্ণেয়; তার উষ্ণতা আছে, অথচ তা প্রত্যক্ষের বিচারে নেই। এভাবে আমাদের পৃথিবী অস্তিত্বের বহুবিধ বিস্ময় নিয়ে বিদ্যমান। আমরা কখনই সরলীকরণ করে অস্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে পারব না।

পার্থিব অস্তিত্ব যেখানে এত জটিল, সেখানে অস্তিত্বের অতীত যে অস্তিত্ব, তাকে আমরা কি করে অনুভব করব? প্রশ্ন হতে পারে, অস্তিত্বের অতীত আবার অস্তিত্ব কি?

পূর্বেই বলেছি, অধিকাংশ অস্তিত্বই অপ্রতুলতার বাইরে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্যের সীমার মধ্যে সহজে আসবে না। তা এত মহান, এত বিরাট এবং এত অকল্পনীয় যে, তাকে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বোধের আয়ত্তে আনতে পারি না। যেমন অসম্ভব শব্দ যা আমাদের শ্রবণ ধারণ করতে অক্ষম, সে শব্দের সাড়া আমরা পাই না। অথচ বৈজ্ঞানিক

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যয়ে জানি, সে শব্দ আছে। তেমনি অস্তিত্বের অতীত যে অস্তিত্ব তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধিকারে নেই, কিন্তু তা বিশ্বাসের অভিনিবেশে এবং প্রত্যয়ে আছে।

আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটি অংশ। এরকম অজস্র সৌরজগত অনন্তের মধ্যে বিচরণ করছে। এই যে অনাদি অনন্ত চরাচর— এগুলোর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। কোন মানুষ এ অনন্তের প্রহেলিকা ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু অনাদি অনন্তের অস্তিত্ব যে আছে, তা আমরা বিশ্বাসের বলয়ের মধ্যে আবিষ্কার করি। বস্তুবাদী জগৎ এ বিশ্বাসের বলয়কে ভেঙ্গে দিতে চায়, কিন্তু কোনদিন তা ভাঙতে পারেনি। কেননা অনন্তের যেমন বিশ্লেষণ নেই অনন্তগত অস্তিত্বেরও তেমনি বিশ্লেষণ নেই। যা একস্থানে আছে তা আমি চিহ্নিত করতে পারি। যার চলমানতা আছে তার পশ্চাতে আমি ধাবমান হতে পারি। যা শ্রুতিতে ধরা পড়ে তা শুনবার জন্য আমি উৎকর্ণ হতে পারি, কিন্তু যা সর্বত্রই বিরাজমান তাকে আমি কি করে প্রত্যক্ষ করব?

সে জন্য সাধক বলেছেন— 'আমার অস্তিত্বই তাঁর অস্তিত্ব এবং তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই আমি।' এটা একটি বিশ্বাসের বোধ। এ বোধ কোন প্রকার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। অনেকে বলেন, সর্বসঞ্চারিত যে প্রাণকণা সেটা তো অনন্ত অস্তিত্বের মূলে, কিন্তু তাকে আমি কি করে গ্রহণ করব? কি করে আমার সীমাবদ্ধ প্রকরণের মধ্যে আমি অনন্তকে ধারণ করব? যুগ যুগ ধরে সাধু-সন্তরা এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন, এখনও চেষ্টা করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করে চলবেন। এ চেষ্টার অবধি নেই।

পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে অনন্তের রহস্য জানবার চেষ্টা করেছে এবং এমন একটি অস্তিত্বকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছে যা দৃষ্টিতে পড়ে না, স্পর্শতে অনুভূত হয় না, মানুষের দেহগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় না। তাই মানুষ প্রতীকের দ্বারস্থ হয়েছে যাকে খুশি মতো তৈরি করা যায়, সাজসজ্জায় বিভূষিত করা যায় এবং অনন্ত বোধের ক্ষুদ্রকণা হিসেবে মান্য করা যায়। এভাবেই মানুষ মূর্তি নির্মাণ করেছে, পশু-পাখি এবং বৃক্ষলতাকে পূজা করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির শক্তিকে পরম সত্তার অনুভব হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এভাবে অনন্তের বোধকে কখনই আয়ত্তে আনা যায় না।

সূফীরা সূক্ষ্ম একটি বোধের কথা বলেছেন, যাকে তাঁরা নামকরণ করেছেন 'আলমে আমর' বলে। সূফীরা চেষ্টা করেছেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে রূপহীন, বর্ণহীন-কায়াহীন একটি অনুভূতির মধ্যে জাগ্রত করতে। সূফীরা আল্লাহকে যেরূপে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন তা হচ্ছে আল্লাহর 'জাত' অথবা আল্লাহর অস্তিত্বগত অনুভূতি। খ্রীষ্টধর্মের 'গড' কিন্তু 'আল্লাহ' নয়, হিন্দুদের ভগবানও আল্লাহ্ নয়, ফারসী 'খুদা' শব্দটিও আল্লাহর 'জাত'কে সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত করে না। আল্লাহ্ শব্দটি পার্থিব কোন অর্থ বহন করে না, এটি একটি ঐশীবোধের স্মারক। কিন্তু গড শব্দটির অর্থ আছে। গড শব্দটি একটি পুরুষ-শক্তিকে চিহ্নিত করে, যার বাস্তব জগৎগত অভিব্যক্তি হচ্ছে তার পুত্র যীশু। গড একমাত্র অনন্ত শক্তি নয়, কেননা রমণীবোধ, পুরুষবোধ, পিতৃ-মাতৃবোধ এবং পুত্রবোধ গড শব্দটির চরিত্রে আছে। তাই যে অস্তিত্ব বোধের অতীত, তার স্মারক 'গড' কখনও হতে পারে না।

হিন্দুধর্মে 'ভগবান' শব্দটিও অর্থগতভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভগবানের পুরুষরূপ আছে এবং রমণীরূপ আছে, জনন প্রক্রিয়ার প্রবর্তনা আছে। সুতরাং 'ভগবান' কখনও অনাদি অনন্ত অস্তিত্বকে বোঝায় না। 'ভগবান' শব্দটি মহত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত, তাই গুণবাচক, অস্তিত্ববাচক নয়। 'আল্লাহ' শব্দটির ক্ষেত্রে অর্থ অন্য রকম। এ শব্দটি কোন গুণের ব্যাখ্যা

www.nagorikpathagar.org

করে না, কিন্তু একটি অনাদি— অনন্তের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যেহেতু অনাদি-অনন্তকে বিশ্লেষণ করতে পারি না, বিজ্ঞানও এ বিশ্লেষণে অক্ষম। বিজ্ঞানও সীমাহীন অনন্তের কথা বলে, যে অনন্ত আদি চিহ্নহীন এবং সমাপ্তি চিহ্নহীন। বিজ্ঞান শুধু এই অনন্ত শূন্যের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির স্ফূরণ অনুসন্ধান করে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণ এরকম একটি শক্তি, আলোকরশ্মি অন্য একটি শক্তি, বিদ্যুতের অভিঘাত আরেকটি শক্তি। মহাশূন্যে অনির্ণেয় অন্ধকার গুহাগুলো আরও অনেক শক্তি। মহাশূন্যে ধ্বনির প্রসার আছে, সঞ্চয় আছে, আলোর প্রসার আছে, আলোর সঞ্চয় আছে, আকর্ষণ-বিকর্ষণের সুনিশ্চয়তা আছে। এগুলো সবই গুণ। এগুলো কোনটাই অনন্ত অস্তিত্বের স্বরূপ নয়।

সূফীরা আল্লাহ্'র জাতের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সিফাতের কথাও বলেছেন। 'সিফাত' হচ্ছে 'গুণ'। এই গুণাবলী অজস্র এবং সেগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। শুধু আমরা জাগতিক বিচারে গুণাবলীর কিছু সংখ্যা চিহ্নিত করতে পারি। এখানেও সংখ্যা আছে, কেননা মানুষও আল্লাহর অনেক গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহই মানুষকে এ সমস্ত গুণ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তার কর্ম এবং বোধের সীমাবন্ধনের কারণে তার উপর অর্পিত গুণকেও সীমাবদ্ধ করেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মানুষও ক্ষমা করতে জানে। কিন্তু মানুষ তার জন্ম-মৃত্যুর সীমানার মধ্যে কতটুকু ক্ষমার অধিকার রাখে? তেমনি দয়া এবং দাক্ষিণ্য– আল্লাহ্র দয়া ও দাক্ষিণ্য তো অপার। মানুষ শত চেষ্টা করেও আল্লাহর দয়ার সীমা খুঁজে পায় না। যদি নিষ্ঠুরতার কথা বলি, সেই নিষ্ঠুরতাও মানুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। মানুষ নিষ্ঠুরতায় মৃত্যু পর্যন্ত যেতে পারে, তার অধিক যেতে পারে না। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুরতার সীমা নেই। তাঁর প্রবল প্রলয়ে লোকালয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের দৃষ্টিগোচর পৃথিবীর সমস্ত শৃংখলা বিনষ্ট হতে পারে। সেজন্যই সূফীরা বলেন, আল্লাহর 'জাত' এবং সিফাত'এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সিফাতকে আমরা অংশত অনুভব করি এবং এই অনুভবের মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহর 'জাত' সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পাই।

মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী হতে চায়, অশেষ বেদনাকে সহ্য করতে চায় এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়। এগুলো মানুষের ইচ্ছা। কিন্তু এগুলোর অধিকার মানুষ কখনও পায় না। তবু কবিরা কল্পনা করেন যে, মানুষ সীমাহীনকে গ্রহণ করতে পারে। মানুষ তাই প্রমেথিউসের কল্পনা করেছে এবং বলেছে, মানুষের আশা অথবা কল্পনা যে বেদনা সীমাহীন সেই বেদনায় নিপীড়িত হয়ে যে অটল থাকে সেই তো পুরুষ। কিন্তু শেলী যে প্রমেথিউসের কল্পনা করেছিলেন সেই প্রমেথিউস মানুষ নয়, সে টাইটান; অশেষ শক্তিধর একটি অস্তিত্ব। মানুষ যা পারে সেটি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সীমাবন্ধনের মধ্যে সকল সম্ভাব্য বেদনাকে সহ্য করা। শেকস্‌পীয়র একথাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন তাঁর 'কিং লিয়র' নাটকে। সেখানে মানুষের সহ্য ক্ষমতাকে চরমতম গ্লানির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু শেকসপিয়র সীমাবন্ধনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন— 'মানুষ যতটুকু সহ্য করে তা জন্ম-মৃত্যুর সীমাবন্ধনের মধ্যে সহ্য করে।'

শেকসপীয়রের কথা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়— 'আমরা এ পৃথিবীতে আমাদের আগমন যেমন সহ্য করব, তেমনি এ পৃথিবী থেকে তিরোধানকে সহ্য করতে হবে। পরিপূর্ণতা অর্জন করাই হচ্ছে একমাত্র কথা।'

মানুষের পার্থিব জীবনটাই মানুষের সীমাবদ্ধতার মাপকাঠি, কিন্তু বিধাতার কোন মাপকাঠি নেই। যা জন্ম-মৃত্যুর বাইরে, যা সকল লৌকিকের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যা

www.nagorikpathagar.org

আদিহীন, অনাদি-অনন্ত সেই অস্তিত্বের কল্পনা আমরা কি করে করতে পারি?

আল্লাহর যে গুণাবলী আছে জাগতিক সীমায় সেইগুণাবলীর চর্চা করে আমরা অনন্তকে স্পর্শ করার সবিনয় ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি। আমাদের প্রজ্ঞাই বলে দেবে অনন্ত অস্তিত্বের রহস্য কোথায়। একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফলবান বৃক্ষে রূপান্তরিত হলো যে রহস্যের মধ্য দিয়ে বীজটি একটি প্রাণের স্ফুরণ ঘটালো সে রহস্য আমরা জানি না, বিজ্ঞানও জানে না। কিন্তু রহস্য যে আছে, তা আমরা স্বীকার করি। এই রহস্যকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই আমরা অনন্ত অস্তিত্বকে স্বীকার করি। একটি হাঁসের ডিম থেকে হাঁসের ছানা বেরিয়ে এলো এবং মুরগির ডিম থেকে মুরগির ছানা; উভয়ই একসঙ্গে চলতে লাগলো। কিন্তু একজায়গায় পানি দেখে হাঁসের ছানা লাফিয়ে পড়ল পানিতে, কিন্তু মুরগির ছানা দৌড়ে অন্যদিকে চলে গেল। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার এমন কি রহস্য আছে, যে রহস্যের কারণে হাঁসের ছানা পানিকে গ্রহণ করল এবং মুরগির ছানা মাটিকে? এ রহস্যের সন্ধান কেউ পায়নি। কিন্তু রহস্য যে আছে, তা অনস্বীকার্য। এই স্বীকার করার মধ্যেই অনন্ত অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সম্ভব-অসম্ভবের বাইরে যে রহস্য, সে রহস্য যে আছে এটা আমরা জানি এবং এই জানার মধ্যে দিয়ে একটি অনন্ত অস্তিত্বকে আমরা ধারণায় আনতে পারি।

'মুজাদ্দেদ আলফেসানী' একজন অসাধারণ মনীষী ছিলেন। সূফী তত্ত্বজ্ঞ হিসেবে তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি পৃথিবীতে খুবই কম ছিলেন, যিনি সূফী সাধনা এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বকে জানবার চেষ্টা করেছেন এবং নিজে যা জেনেছেন তা সকলের জন্য প্রকাশ করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেছেন— 'আল্লাহর' অস্তিত্ব রূহের সাহায্যে অনুধাবন করা যায় এবং রুহ হচ্ছে এমন একটি উপলব্ধি যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অথচ যা একজন সূফীর বোধের আয়ত্তে। কেননা যিনি সূফী তিনি রহস্যকে ইন্দ্রিয়গোচরে আনতে চান, তাই আপন শরীরের মধ্যে বিভিন্ন অধিষ্ঠানের স্থিতি নির্মাণ করে অলৌকিককে নিজের বোধের মধ্যে আনেন।'

বিষয়টি জটিল। কিন্তু মুজাদ্দেদের বিশ্লেষণ-সূত্র যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহলে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর যে অস্তিত্ব রয়েছে সে অস্তিত্বকে প্রতিদিন আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে অস্তিত্বও কিন্তু অদৃশ্যের মূলে উদ্ভাসিত। সৃষ্টি-জগতের সকল বস্তুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের অঙ্গীকার আছে– রং এর মধ্যে আছে, আকৃতির মধ্যে আছে, বীজের মধ্যে আছে, গন্ধের মধ্যে আছে। এগুলো আমাদের বোধের আয়ত্তে যদিও এগুলো মূল রহস্যের বিবেচনায় আসে না। মানুষ হিসেবে আমাদের শরীর আছে, এই শরীরে বিচিত্র প্রকার অনুভূতি আছে এবং এই শরীরকে অস্বীকার করে কিন্তু অনন্ত অসীমকে ধারণা করা যায় না, অনন্ত অসীম কখনো প্রতীকের মধ্যে ধরা পড়ে না, মানুষই সাধনার সাহায্যে অনন্তের নিকট গিয়ে পৌঁছায়। পৃথিবী আছে বলেই আমরা আছি এবং পৃথিবীর যাবত লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনন্তের আস্বাদন আমরা করতে পারি। তাই আল্লাহর গুণাবলী বা সিফাতের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব বা জাতের কাছে পৌঁছাতে হবে। রহস্য হয়তো রহস্যই থাকবে, কিন্তু রহস্য যে আছে সেই জ্ঞানটিই আমাদেরকে রহস্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর অস্তিত্বের অনন্যতা

সূরা বাকারায় মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন— "সে সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করবো।" ফেরেস্তাগণ মন্তব্য করেছিলো, "আপনি কি এমন একজনকে স্থাপন করবেন যে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘর্ষ সৃষ্টি করবে, যখন আমরা অনুক্ষণ আপনার আদেশ পালন করছি এবং আপনার নামকে মহীয়ান করছি?" আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।" তখন আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম এবং তাৎপর্য শেখালেন এবং ফেরেস্তাগণকে বললেন, যদি তোমাদের উক্তি সত্য হয় তাহলে এ সমস্ত বস্তুর নাম বলো। তারা বললো, হে প্রভু! আপনি তো সর্বজ্ঞাতা এবং সর্ববিজ্ঞ। আমরা শুধু তা-ই জানি, যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি তখন আদমের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি এদের সকল বস্তুর নাম জানিয়ে দাও এবং যখন আদম নামগুলো উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ বললেন, আমি কি বলিনি যে, আমি স্বর্গ ও মর্ত্যের গোপন রহস্য জানি? তোমাদের যত কিছু প্রকাশ্য তা আমি জানি এবং যত কিছু গোপন তা-ও জানি। এবং যখন আমি ফেরেস্তাগণকে আদমের সামনে মাথা নত করতে বললাম, এক ইবলিস ছাড়া সকলেই আদেশ মান্য করলো। গর্বের কারণে সে বিনত হলো না, তাই সে উদ্ধৃত হলো।'

যুক্তি এবং বিশ্বাস সমার্থক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধি যুক্তি এবং বিবেচনার সাহায্যে। এভাবেই সে তার পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং আপন শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে ন্যায় এবং নীতি-নির্ভর কার্যপদ্ধতি, যা জীবনকে পরিচালিত করে। শুধু যুক্তির সাহায্যে জীবন যাপিত হয় না। বিশ্বাস হচ্ছে একটি স্বীকৃতি, যা জীবনকে উদ্দেশ্যময় করে। আমরা প্রয়োজনবোধে বিশ্বাসকে জীবনের জন্য নির্বাচন করি না। বিশ্বাস একটি গতি হিসেবে জীবনকে সত্য এবং আনন্দের মধ্যে প্রবাহিত রাখে।

সকল ফেরেশতা যখন আল্লাহর আদেশ মান্য করেছিল, তখন একমাত্র ইবলিস মান্য করেনি। সে তার গর্বের কারণে উদ্ধত হয়েছিল। এ গর্বের কারণ কি? এমন কোন প্ররোচনা ছিল যার জন্য সে আল্লাহর আদেশ পর্যন্ত অমান্য করতে সাহসী হয়েছিল? সৃষ্টি রহস্যে একটি দ্বৈততা আছে; ভালো এবং মন্দের মধ্যে যুক্তি এবং বিশ্বাসের মধ্যে, গর্ব এবং বিনয়ের মধ্যে, আশা এবং আশঙ্কার মধ্যে। মানুষের সকল কর্মে, কৌশলে এবং প্রচেষ্টায় এ দ্বৈততা অনুভব করা যায়। ইবলিস সামগ্রিকভাবে যুক্তির উপর নির্ভর করেছিল, তাই সে আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল অবিনয়ে এবং ঔদ্ধত্যে।

কপটচারী ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গে একই সূরায় অন্যত্র বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে যখন বলা হলো তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর যেমন অন্য সবাই করেছে, তারা তখন বললো, নির্বোধরা যেমন বিশ্বাস করে আমরা কি তাই করবো?'

দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ বিশ্বাস নৈপুণ্যকে মূর্খতার সমান্তরাল ভাবে। এদের কাছে বিচার এবং বুদ্ধিই হচ্ছে মুখ্য। এরা বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের অভিপ্রায়কে অস্বীকার করে। যা যুক্তির সাহায্যে তারা প্রমাণ করতে পারে না, বুদ্ধির অহমিকায় তাকে তারা অস্বীকার করে।

www.nagorikpathagar.org

তারা মনে করে, বিশ্বাস হচ্ছে তাদের জন্য, যারা অজ্ঞ এবং বিচারের কুশলতা যাদের নেই।

যখন আল্লাহ্ আদমকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে স্থাপনার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ফেরেস্তারা জানতে চাইলো যেখানে বিধাতার সকল নির্দেশ তারাই সর্বতোভাবে পালন করছে সেখানে মনুষ্য সৃষ্টির কি কোনও প্রয়োজন আছে?

আল্লামা ইউসুফ আলী ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন— 'ফেরেস্তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির একদিক মাত্র। তারা অনুগত এবং আদেশ পালনকারী, তাদের ইচ্ছাশক্তি নেই এবং আবেগ নেই। নির্বাচন করার অধিকার তারা অর্জন করেনি। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তিনিই হতে পারেন যিনি কোনও কর্মের বা চিন্তার সূচনা করতে পারেন, যার স্বাধীন কর্মক্ষমতা বিধাতার ইচ্ছারই অঙ্গীকার বহন করে।'

সূরা বাকারায় ইব্রাহীমের প্রার্থনা একটি অসাধারণ নিয়ম, প্রত্যাশা, সৃষ্টি এবং সততা সংরক্ষণের ইচ্ছাকে বহন করছে।

আল্লাহ ইব্রাহীমকে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করলেন এবং যখন তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, আল্লাহ তাঁকে বললেন— 'আমি তোমাকে মানবকুলের মধ্যে নেতৃপদ দেবো। ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, আমার বংশধরগণের জন্য কি ব্যবস্থা হবে? উত্তরে আল্লাহ বললেন, যারা পথভ্রষ্ট তাদের প্রতি আমার কৃপা প্রসারিত নয়। আমরা কাবাগৃহকে মানুষের আশ্রয় হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং আদেশ করেছি যেন তা উপাসনার চিরস্থায়ী ক্ষেত্র হয় যেখানে ইব্রাহীম প্রার্থনা করতেন। ইব্রাহীম এবং ইসমাইলের উপর নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা উক্ত স্থানকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেন সকল মানুষের ধ্যান এবং উপাসনার জন্য, মস্তক আনত করবার জন্য, পরিদর্শন এবং নিমগ্নচিত্ততার জন্য। ইব্রাহীম আল্লাহকে লক্ষ্য করে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন : হে প্রভু, এ নগরকে শান্তির নগরে পরিণত করো এবং যারা তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভবিষ্যৎকালের প্রতি তাদের সকল স্বাদের ফল প্রদান করো। উত্তর এলো, তাদের জন্যও আহার্য সংরক্ষিত থাকবে পৃথিবীতে, যারা বিশ্বাস করে না। অবশ্য পরলোকে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ, তারা আনীত হবে নরকের যন্ত্রণার মধ্যে। স্মরণ করো সে মহান মুহূর্তের কথা, যখন ইব্রাহীম এবং ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমাদের বিশ্বাসী মুসলমানে পরিণত করো এবং আমাদের বংশধরগণকে তোমার প্রতি উৎসর্গীকৃত করো। প্রার্থনায় আমাদের পরিচালিত কর এবং পাপের জন্য আমাদের ক্ষমা কর। তুমি তো সর্বদয়ালু এবং করুণার প্রভু! হে প্রভু, এ সমস্ত মানুষের জন্য তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পয়গাম্বর বা প্রেরিতপুরুষ প্রদান করো, যারা জনগণের মধ্যে তোমার বাণী ছড়িয়ে দেবেন এবং পবিত্র গ্রন্থের আলোতে এবং জ্ঞানের মহিমায় তাদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করবে। তুমিই একমাত্র মহা মহীয়ান এবং একমাত্র জ্ঞানী।'

মানুষের গভীরতম ইচ্ছা এবং আন্তরিক অভিপ্রায়ের নিবেদন হচ্ছে মুনাজাত বা প্রার্থনা। প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষ একটি যোগসূত্র স্থাপন করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। প্রার্থনাতেই প্রার্থনার সিদ্ধি, কেননা আন্তরিক প্রার্থনায় চিত্তে স্বস্তি জাগে। প্রার্থনার মুহূর্ত হচ্ছে পরিপূর্ণতার মুহূর্ত, কেননা প্রার্থনা হচ্ছে আশা ও আশ্বাসের প্রতিষ্ঠা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অসম্ভব ধৈর্য এবং সহনশীলতার মাধ্যমে, ক্ষোভহীনতা এবং নিষ্কলুষ বিনয়ে তিনি সমস্ত বিপদকে অতিক্রম করেছিলেন। এভাবেই তিনি নেতৃপদের অধিকার অর্জন করেন। তাঁর সমগ্র জীবন ছিলো

www.nagorikpathagar.org

ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জীবন, সত্য প্রতিষ্ঠার জীবন। যে অবস্থায় অন্য মানুষ শঙ্কিত হতো সে অবস্থায়ও তিনি অকুতোভয় ছিলেন।

এ প্রার্থনায় বিশ্ববিভুর একটি বিশেষ বিচার পাই, সেটা হচ্ছে— কোনও মানুষকে তার আহার্য থেকে বঞ্চিত করা যায় না, যেমন আলো থেকে এবং বাতাস থেকেও বঞ্চিত করা যায় না। জন্মসূত্রেই প্রত্যেককে বিধাতা এ অধিকার দিয়েছেন। পাপাচারী এবং কৃতঘ্নের প্রতিও এ অধিকারের পূর্ণ প্রশ্রয় আছে। তাই মানুষ হিসেবে আমরা অপরাধী হব, যদি কাউকে আমরা নিঃসম্বল করার চেষ্টা করি। ন্যায়বান ব্যক্তি পবিত্রতার সাহায্যে আল্লাহর আনুকূল্য পায়, কিন্তু পাপীও তার মনুষ্য জন্মের সম্পর্কের জন্য আহার্যের সঙ্গতি পায়। সুতরাং তাকে তো বিনম্রতায় এবং কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি ফেরানো কর্তব্য।

মুসলমান শব্দের অর্থ হচ্ছে সে ব্যক্তিই মুসলমান যে আল্লাহর অধিকারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, যিনি তার একমাত্র প্রভু, অধিকর্তা এবং শাসক। এই সমর্পণশীলতাতেই ইসলামের মূল তাৎপর্য। সমর্পণের সাহায্যেই আমরা অধিকার বর্জন করে অধিকার অর্জন করি।

'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক বিবেচনা আছে। যখন একজন সূফী সাধক ভ্রমণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেন, তখন তাকে ভাবতে হবে কেন তিনি ভ্রমণ করবেন? তিনি ভ্রমণ করবেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সদিচ্ছায় ও সৎবিবেচনায় তিনি পথ চলবেন। প্রকাশ্যে তিনি পথিক, তিনি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাচ্ছেন। অন্তর্লোকেও তাঁর যাত্রা হবে পার্থিব আকর্ষণ থেকে দূরে পবিত্রতার মোহমুক্ত ক্ষেত্রে। প্রসন্নতা এবং পরিচ্ছন্নতার মধ্যে তাকে মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সুস্পষ্ট এবং সুপরিজ্ঞাতভাবে তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হবে হয় তীর্থযাত্রা অথবা অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা, পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন, জ্ঞানান্বেষণ, সত্য সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান, জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সাধু-সন্তদের সান্নিধ্য লাভ। এ সব উদ্দেশ্য না থাকলে ভ্রমণ অর্থহীন হবে। তিনি গাত্রাবরণ পরিহিত থাকবেন, প্রার্থনার জায়নামাজ তার সঙ্গে থাকবে, হাতে পানির গাত্র থাকবে, রজ্জু থাকবে, জুতো থাকবে, যষ্ঠি থাকবে। গাত্রাবরণের প্রয়োজন নগ্নতা ঢাকবার জন্য, জায়নামাজ নামাজের জন্য, পানির পাত্র গাত্র প্রক্ষালনের জন্য, যষ্ঠি আত্মরক্ষার জন্য। ভ্রমণকারী শুধুমাত্র পথিক নন, দেশদর্শনকারী নিরঙ্কুশ যাত্রী নন, তিনি চিত্তশুদ্ধি এবং পবিত্রতার সন্ধানী। এক অঞ্চলে চিরকাল অবস্থিতিকে গ্রাহ্য করে আমরা চিত্ত বিকাশের সুযোগকে রুদ্ধ করি। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞানের বিকাশ এবং সত্যের অন্বেষণে অভিযাত্রায় আমরা আনন্দকে পাই, অভিনবকে পাই এবং ঔদার্যকে আবিষ্কার করি। যিনি পথ চলবেন তিনি অহমিকাশূন্য হয়ে পথ চলবেন। ঐশ্বর্যের অহমিকা যেমন, দারিদ্র্যের অহমিকাও তেমন। উভয়ই মানুষকে আত্মম্ভরি করে। সুতরাং জীর্ণ কন্থা পরিধান করে গর্ব অনুভব করা যেমন অপরাধ, রেশমী বস্ত্র পরিধান করে ঐশ্বর্যের প্রদর্শনও তেমনি অপরাধ।

কথিত আছে, 'শেখ আবু মুসলিম ফারিস বিল গালিব আল ফারিসি' একদিন তাঁর পথযাত্রায় একজন সূফীর সাক্ষাৎ পেলেন। দেখলেন তিনি একটি আরামদায়ক শয্যায় শয়ন করে আছেন, চারটি তাকায় হেলান দিয়ে। ফারসীতে যাকে বলে তাখতি চাহার বালিশ, এবং তাঁর গাত্রাবরণ মিশরের মূল্যবান সূতীবস্ত্রের। আবু মুসলিমের গাত্রাবরণ ছিল জীর্ণ এবং তা ছিল মলিন। তিনি নিজেকে সর্বপ্রকার সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত করে জীর্ণ হয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়েছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন— 'যিনি শয়ন করে আছেন তিনি একজন দরবেশ, আমিও একজন সূফী। কিন্তু তিনি কী অসাধারণ আরামে আছেন আর আমি জীর্ণতাকে ধার্য করেছি।'

শয়নকারী সূফীর নাম ছিল 'আবু সাঈদ বিন আবুল খায়ের'। তিনি জেগে উঠে আবু মুসলিমের চিন্তার ধারা অনুভব করতে পারলেন। তিনি বললেন— 'হে আবু মুসলিম, অহংকারী এবং আত্মম্ভরী কি কখনও দরবেশ হতে পারে? যেহেতু আমি আল্লাহকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি, আল্লাহ আমাকে আরামদায়ক শয্যায় শয়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তুমি সর্বত্রই তোমাকে দেখো, তাই জীর্ণতা এবং যন্ত্রণাই হয়েছে তোমর ভূষণ।'

আল্লাহকে পাবার দুটো পথ আছে। কেউ হয়তো ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আল্লাহকে পায়, আবার কেউ হয়তো নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে আল্লাহকে চায়। কিন্তু আল্লাহ উভয় অবস্থারই উর্ধ্বে। সকল অবস্থায় অহমিকা থেকে মুক্ত না হলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। এ কথাগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, যিনি আল্লাহর পথে পথিক, তাঁকে সর্বতোভাবে আত্মচৈতন্য থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহকে অনুভব করতে হবে। একটি বৃক্ষ যেমন কোন রকম অহংকার নিয়ে বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু একটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বৃদ্ধি পায়, তেমনি একজন সূফীকে আল্লাহর উপর চূড়ান্ত নির্ভরতায় অগ্রসর হতে হবে। এই পৃথিবী যেহেতু সকল প্রাণীর জন্য সাময়িক আবাসস্থল এবং পৃথিবীতে যেহেতু আমি পূর্ণভাবে আশ্রয় করে চিরঞ্জীব হতে পারবো না, সুতরাং যিনি এ পৃথিবীর সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ বিরাজমান, তাঁর কাছেই আমি নিজেকে ন্যস্ত করবো। আমি ভাববো, যে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, যে কলকাকলী চতুর্দিকে ধ্বনিত হচ্ছে এবং যে সঞ্জীবতা এ পৃথিবীতে আমাদের আশ্রয়, সকল কিছুতেই তিনি অবস্থান করছেন। অর্থাৎ আমি কোথাও নেই, তিনি তো সর্বত্র। এই অনুভব থেকেই আমরা ঐশ্বর্যের সাধনা করবো না, নিঃস্বতারও সাধনা করবো না, আমরা প্রতিনিয়ত শুধু তাকেই অনুভব করবো। এই অনুভব প্রাচুর্য যখন আমাদের সমস্ত স্নায়ু ও শিরা-উপশিরাকে আলোড়িত করবে এবং যখন আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁর অবস্থানের বার্তার আবেশ আসবে, তখনই আমরা পার্থিব আকর্ষণের দায়মুক্ত হবো।

রাসূলে খোদা যখনই কোথাও যেতেন, তখন বিনম্র চরণে পথ হাঁটতেন এবং কারও গৃহদ্বারে এলে গৃহস্বামীকে সম্মানের সাথে সম্ভাষণ করতেন। তিনি গৃহের অভ্যন্তরে পাদুকা পরিহিত অবস্থায় পা রাখতেন না, পাদুকা খুলে প্রবেশ করতেন। তিনি কিছুটা আনত হয়ে প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করতেন, এবং কখনও গৃহবাসীদের কার্যধারায় বিপত্তি সৃষ্টি করতেন না। এককথায় বলা যায়, রসূলের আদর্শ ছিল বিনয়, ধৈর্য, অহমিকাশূন্যতা এবং আল্লাহর কাছে সর্বস্ব সমর্পণের একটি প্রত্যয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে রসুল (সাঃ)-কে অনুসরণ করা এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়া। রসুল (সঃ) কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেননি। কেননা ক্রোধ প্রকাশ করলে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে হয়। তিনি মানুষের কুৎসা কখনও রটনা করতেন না। কেননা কুৎসার সাহায্যে আমরা সৃষ্টির তাৎপর্যকে আহত করি। একজন সূফী সাধক বিনয়ে, ধৈর্যে আনন্দিত নিঃস্বতায় সর্বক্ষণ, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে অনুভব করবেন। এই অনুভবের মধ্যেই তাঁর ত্রাণ, এই অনুভবের মধ্যে তাঁর শান্তি এবং অবশেষে এই অনুভবই পুষ্পের শোভা ও সুগন্ধ।

প্রত্যেক মানুষের বাইরের একটি আকৃতি আছে, দৃশ্যগত গুণাবলী আছে, যেমন— গায়ের রং, গতিবিধি, শারীরিক অঙ্গসংস্থান ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোই তো সব নয়। তার

www.nagorikpathagar.org

একটি অন্তর্লোক আছে যে অন্তর্লোকের পরিচয় আমাদের পেতে হবে। একজনের মানসলোকে কি সব চিন্তা আনাগোনা করে অথবা তার ইচ্ছা বা অভিমান এগুলো আমাদের জানতে হবে। তা না হলে মানুষ মানুষে তো সম্প্রীতির বন্ধন হবে না। আমরা ইতর প্রাণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কেও কিছুটা জানি। অবশ্য গাছপালা সম্পর্কে জানি না, পাথর সম্পর্কেও জানি না। অর্থাৎ গাছ অথবা পাথরের কোনরূপ ইচ্ছা আছে কিনা জানি না।

সেন্টপল বলেছিলেন— 'আমরা জানি, অনন্তকাল ধরে বিশ্ব সৃষ্টি-বেদনার মধ্য দিয়ে বহমান।'

মানুষ অথবা ইতর প্রাণী সম্পর্কে ভাবলেও এ কথার কিছুটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের চিত্তের অভ্যন্তরে অনবরত কি ঘটছে তা কি আমরা জানি? যেহেতু সাধারণ বিবেচনায় জানি না, সুতরাং বলা যেতে পারে, আমরা অদৃশ্য মানুষের পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের অগোচরে থাকতে চায়, সে তার মনের অবস্থা অন্যকে জানাতে চায় না। সে বলে—'আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাজ তুমি কখনও যখন আমরা কেউ আমাদের চিত্তকে অন্যের কাছে উদঘাটন করতে চাই, তখনও যেন পুরোপুরিভাবে পারি না। হয়তো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করি, হয়তো নতুন প্রকরণ নির্মাণ করি, হয়তো শব্দ যখন পাই না তখন কান্নার সাহায্যে, স্পর্শের সাহায্যে এবং হয়তো ক্রোধের সাহায্যে মনের অভিব্যক্তি ঘটাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমৃদ্ধি অথবা অপলাপ ঘটে অন্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দ্বারা। এ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ হবার চেষ্টা করলেও আমরা নিঃসঙ্গ হতে পারি না, আপনাকে নিয়ে একাকী কখনও বিবৃত থাকতে পারি না— অন্যকে গ্রাহ্য করতেই হয়। এ সম্পর্ক না থাকলে ঐশ্বর্য বলুন, যশ বলুন, শক্তি বলুন কোনো কিছুই আমাদের স্বস্তি ও তৃপ্তি দিতে পারে না। পৃথিবীকে যথার্থরূপে বাসোপযোগী তখনই আমরা করি যখন আমরা অন্যকে বুঝতে শিখি এবং অন্যকে সুযোগ দেই আমাদের বুঝতে।

আমাদের প্রকাশ্য আচরণ, সর্বজনসমক্ষে বক্তৃতা এবং অঙ্গসঞ্চালন আমাদের অন্তরের পরিচয় বহন করে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত পরিচয়ই বহন করে। চিত্তলোকের অদৃশ্য অভিপ্রায়গুলো কি সতত প্রকাশ্য হয়? কিন্তু আমাদের বাইরের আচরণ থেকে অনেক সময় চিত্তের নিগূঢ় রহস্যকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। যিনি কথা বলেছেন তার বাক্যাবলী নয়, কিন্তু উচ্চারণের পশ্চাতে তার যথার্থ অভিপ্রায়কে অনুভব করতে হবে। অর্থাৎ কোন কিছু উচ্চারিত হবার পূর্বে ধারণা করতে হবে বক্তা কি বলতে পারেন। অন্তরের ইচ্ছার বা অনুভূতির বা বিশ্বাসের বা জিজ্ঞাসার চিত্র উদঘাটিত হয় আমাদের দৃষ্টিতে, শরীরী চাঞ্চল্যে, হয়তো বা কখনও উচ্চারণের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যে। এটাকে বলা যায় অভ্যন্তরের চিন্তার স্বতঃস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

সূফী-সন্তদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁরা মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেই তার অন্তরের কথা উপলব্ধি করতে পারেন। এটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা মানুষের অন্তরের বিভিন্ন অভিপ্রায় বা চিন্তা তার শরীরী চৈতন্যে ধরা পড়বেই। যিনি বুদ্ধিমান তিনিই এ প্রতীকগুলো পাঠ করতে পারবেন।

কখনও কখনও কাউকে কথা বলতে শুনলে আমরা বলে থাকি— 'আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে কিছু বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আপনি কি বলতে চান তা আমি বুঝতে পারছি।' এত স্পষ্ট হচ্ছে যে আমাদের বক্তব্য শুধু যে ভাষার মধ্যেই ধরা পড়বে তাই নয়, আমাদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে, শব্দোচ্চারণের বিশেষ প্রক্রিয়ায়ও ধরা পড়ে। হস্ত সঞ্চালনেও ধরা পড়ে

www.nagorikpathagar.org

অথবা হয়তো অপরীক্ষিত অদৃশ্য কোনও উপায়ে একজনের মানসলোকের গোপন অভিজ্ঞতা অন্যের মানসলোকে প্রতিবিম্বিত হয়।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে— 'মিটিং অব মাইন্ডস'–মানে সাজুয্য। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এ মিলন যদি না ঘটে তা হলে আমাদের অস্তিত্ব একটি দুর্ঘটনায় পরিণত হয়। এ মিলনের জন্য প্রয়োজন 'আমি' এবং 'তুমি'র সমন্বয় সাধন। আমি শুধু আমাকেই জানবো না, তোমাকেও জানবো এবং একই বিবেচনায় জানবো অর্থাৎ একটি প্রবল সহানুভূতির সাহায্যে তোমার মানসচৈতন্যকে উদঘাটন করবো।

দুর্গতির সময়ে আশ্বাস মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। পবিত্র কোরআন শরীফে এ আশ্বাসবাণী অনেকবার এসেছে। কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছেছে, আত্মরক্ষার জন্য কিছুসংখ্যক মুসলমান যখন আবিসিনিয়ায় গিয়েছেন, যখন অত্যাচারীরা উদ্ধত রয়েছে সর্বাংশে রসুলকে নিধন করার জন্য, তখনই সূরা আল আনামের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়।

সেখানে আল্লাহ বলেছেন— 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথায় কর্ণপাত করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তারা শ্রবণশক্তিরহিত এবং তাদের চিত্ত নিরুদ্ধ, সুতরাং কোনো কিছুই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের যে কোনও কিছুই দেখানো হোক না কেন, তারা বিশ্বাস করবে না। তারা তোমাদের কাছে আসে শুধু বিতর্ক তুলতে। এবং তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা তোমার সকল কথাকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দেয়। তারা সত্যের দ্বারা পরিচালিত হতে চায় না এবং অন্যকেও পরিচালিত হতে দেয় না। কিন্তু তাই বলে ভেবো না তারা তোমার কর্মপথে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারবে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে যদিও তারা তা জানে না। কল্পনা করো, তারা নরকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন বলবে, যদি আমরা আবার প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম তাহলে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হতাম এবং বিধাতার কোনও নির্দেশকে অস্বীকার করতাম না। তারা যথার্থ বিশ্বাসে অবশ্যই এ কথাগুলো বলবে না। যা তারা অস্বীকার করেছিল তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা আর কী বলতে পারে? যদি তাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া যেত তাহলে তারা আগের মতোই আচরণ করতো, তারা মিথ্যাচারী। তারা মনে মনে ভাবে, আমাদের একটি মাত্রই তো জীবন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। যদি তুমি দেখতে বিধাতার সামনে তারা কি রকম আচরণ করে! বিধাতা জিজ্ঞেস করবেন, এখন যে অবস্থায় তোমরা পতিত হয়েছ সেটাই কি সত্য নয়? তারা বলবো, হ্যাঁ। প্রভু তখন বলবেন, তাহলে তোমাদের অবিশ্বাসের শাস্তি ভোগ করো। শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত যারা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য ত্রাণ নেই। তারা তখন আর্তরোল তুলবে, কী ভয়ঙ্কর ভুল আমরা করেছি! এই তো তাদের গতি চিরকালের জন্য পাপের বোঝা পৃষ্ঠদেশে বহন করা। জীবন একটি ক্ষণকালীন আনন্দ মাত্র। ন্যায়বানের জন্য পরকালই যথার্থ আশ্রয়। তুমি কি এটা বুঝতে পারছো না? আমরা জানি তাদের কথায় তুমি দুঃখিত হচ্ছো। তারা তোমাকেই তো প্রত্যাখ্যাত করে না, আল্লাহর বাণীকেও অস্বীকার করে। তোমার পূর্বেও অনেক পয়গম্বর প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু তারা ধৈর্য ধরে সহ্য করেছেন যতক্ষণ না আমরা তাদের সহায়তায় এসেছি। আল্লাহর নির্দেশের কোনও পরিবর্তন কেউ ঘটাতে পারে না। পূর্বতন পয়গম্বরগণ কি অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করেছেন তা তো তুমি জান। মানুষের অসহযোগিতা কি তোমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে? তাহলে যদি তোমার শক্তি থাকে

www.nagorikpathagar.org

আকাশের দিকে একটি সিঁড়ি উত্তোলন করো অথবা ধরিত্রীর অভ্যন্তর খনন করো এবং দেখো তাদের জন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারো কিনা। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই তারা তাঁর নির্দেশের অনুসারী হতো। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, যারা শ্রবণ করে তারাই অনুসরণ করে। এবং যারা মৃত তারা তাদের সমাধিতে অবস্থান করবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান ঘটান। আল্লাহর কাছেই তারা প্রত্যাবর্তন করে।'

আশ্বাসের চেয়ে সমৃদ্ধমান ভাষ্য আর হতে পারে না। এ বাণী কোনও এক যুগের বা সময়ের নয়, সর্বকালের। অনন্তকালীন সত্যের পুরাতত্ত্ব নেই, আমাদের বোধের প্রকৃতি স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সত্য তার অনিবার্য এবং যথাযথ নিয়মে চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

'জীবন হচ্ছে ক্ষণকালীন আনন্দ'– এ কথার তাৎপর্য এ নয় যে, জীবনের কোন গুরুত্ব নেই অথবা জীবন শুধু সাময়িক লীলাবিলাস। মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের অনন্তকালীনতার পরিপ্রেক্ষিতেই এ কথা বলা হয়েছে। প্রশস্ত পরিমুক্তির নির্বাধ যে ব্যাপকতা, তার তুলনায় জীবন একটি রঙ্গমঞ্চ মাত্র, কিন্তু নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে জীবনের এক বলিষ্ঠ সত্যতা আছে।

রসুল (সাঃ) বলেছেন— 'যদি তুমি আল্লাহকে জানো যেভাবে তাঁকে জানা উচিত তাহলে তুমি সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে এবং তোমার নির্দেশে পাহাড় আনত হবে।'

আল্লাহকে আমরা জানতে পারি জ্ঞানগতভাবে এবং আবেগগতভাবে। সূফী ব্যাখ্যায় প্রথমটি হচ্ছে ইলমী এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হালী। এ পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পর জ্ঞানগত উপলব্ধির সাহায্যেই আমরা আশীর্বাদের অধিকারী হব। একজন মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান, যাকে একটি প্রবল উপলব্ধি হিসেবে গণ্য করতে পারি।

কোরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন— 'আমি মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমাকে জানে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার এ দায়িত্ব পালন করে না, শুধু তারাই করে যাদের আল্লাহ এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন এবং যাদের হৃদয় আল্লাহর অনুভূতিতে পূর্ণ হয়।'

এ জ্ঞান হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যে অবস্থার কারণে মানুষ সেসব কিছু থেকে সরে আসে যার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক নেই অর্থাৎ এমন সবকিছু থেকে সরে আসে যেগুলো মানুষকে বিভ্রান্তিতে টেনে আনে। মানুষের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে হবে তার আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিমাপ বিচার করে। এ জ্ঞান যার নেই সে যথার্থই নিঃস্ব এবং মূল্যহীন। এগুলোকে তত্ত্বজ্ঞরা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।

সূফীরা বলেন—'আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে মারিফাত।' আবার কেউ কেউ বলেন, একটা 'হালের' অবস্থা থেকেই আল্লাহর নিকটস্থ হয়। হাল হচ্ছে তন্ময়তা অথবা বলা যায় আবেগগত উপলব্ধি।

মুতাজিলারা বলতেন—'আল্লাহ্ জ্ঞানটা হচ্ছে বুদ্ধির সাহায্যে আহরিত।' একজন আকীল বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সূফীগণ মুতাজিলাদের এ মতবাদকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা বলেন—'বিশ্বাস মানুষকে বলবান করে এবং প্রাণবন্ত করে।'

অধিকাংশ মানুষই তো বিশ্বাসের সাহায্যে আল্লাহর উপলব্ধিতে পৌছায়। জ্ঞান ও বুদ্ধিগত যুক্তির সাহায্যে কি আল্লাহকে কেউ বিশ্লেষণ করে? আল্লাহকে আমরা বিশ্বাসগ

www.nagorikpathagar.org

উপলব্ধিতে আরাধ্য করি। শুধু জ্ঞানী মানুষই আল্লাহকে জানবে এটা সত্য হতে পারে না, আল্লাহকে সকলেই জানবে। এখানে সকল বলতে আমরা শুধু মানুষকেই বুঝি না, বৃক্ষকুল এবং প্রাণিকুলকেও বুঝি। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনুভব করা যায় যে, সকল বস্তুই বিশেষ বিশেষ চৈতন্যের মধ্য দিয়ে এক একটি উপলব্ধিকে আশ্রয় করেছে। একটি বৃক্ষ তার উদ্‌গম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে পত্রপুষ্পে বিকশিত হওয়া পর্যন্ত একটি সজীবতার চৈতন্য নিয়ে ধ্যানস্থ থাকে বলে মনে হয় অথবা রাত্রিকালে সমস্ত প্রকৃতি যখন আমাদের দৃষ্টির সুস্পষ্ট সম্মুখে নয় কেননা তখন অন্ধকার, সে সময় প্রকৃতি একটি বশংবদ বিশ্বস্ততায় নিশ্চয়ই আল্লাহকে অনুভব করে। তেমনি আমরা প্রাণিজগতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখনও লক্ষ্য করি—চৈতন্যের স্বাভাবিক দায়িত্বে এরা প্রত্যেকেই আল্লাহকে বিভিন্নভাবে অনুভব করেছে। এ অনুভবটি এত ব্যাপক, এত প্রবল, এত অন্তর্গূঢ় এবং এত বিশ্বস্ত যে একে বিশ্লেষণ করা যায় না। শুধু নিগূঢ়ভাবে অনুভব করা যায়। কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তার ইচ্ছা না হলে তাকে জানা যায় না। একেই বলা হয় ইনাইয়াত যাকে আমরা সাধারণ ব্যাখ্যায় বলতে পারি দয়া অর্থাৎ আল্লাহর ইনাইয়াত না হলে আল্লাহকে জানা যায় না। আরবীতে আর একটি শব্দ আছে তসলিম, অর্থাৎ মান্য করা। আমরা আল্লাহকে মান্য করবো, তাহলেই আল্লাহকে অনুভব করবো। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে একবার হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল— 'এ বিশ্বাসের স্বরূপ কি?'

হযরত আলী (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন— 'আমি আল্লাহকে জানি আল্লাহর ইচ্ছায় এবং যা আল্লাহর অভিপ্রেত নয় তাকে জানি আল্লাহর আলোকের সাহায্যে।'

আল্লাহ মনুষ্য-শরীর নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং আত্মা তৈরি করে আত্মাকে আপন বশংবদ রাখলেন। কোরআন শরীফে আরও আছে— 'আমি সেই আলোকের স্রষ্টা যে আলোতে বিশ্বাসীরা পরিস্নাত হয়।'

অন্যত্র আছে যে, আল্লাহই মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত করেন বা নিরুদ্ধ করেন। মানুষের কোনও ক্ষমতা নেই শরীরকে জীবন্ত করার এবং আত্মাকে ধরে রাখার অর্থাৎ সৃষ্টির কোনও রহস্যই মানুষের কাছে উদঘটিত নয়। মানুষ শুধুমাত্র প্রাণহীন বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু প্রাণবান বস্তুর প্রাণ-চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। বস্তুর অনন্তকাল ধরে প্রাণ সম্পর্কে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে আমরা বাস করছি। সুতরাং বিশ্লেষণের সাহায্যে নয়, বিশ্বাসের সাহায্যেই আমরা জীবনকে গ্রহণ করেছি। দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্টির কোন তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারে না, সে শুধু তার অনুভূতির সাহায্যে সৃষ্টিকে অনুভব করতে পারে এবং স্রষ্টাকে অবলম্বন করতে পারে। নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও বিবেচনার সাহায্যে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন তাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, একই প্রকারের যুক্তি ও বিচেনার সাহায্যে অনেকে আবার আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারও করতে পারে। প্রথমটিকে বলে তসবীহ এবং দ্বিতীয়টিকে বলে তাতিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ দুই অবস্থার বিপাকের মধ্যে জ্ঞান সর্বক্ষণ সীমাবদ্ধ। তাই আল্লাহকে পেতে হবে বিশ্বাসের অভিনিবেশে এবং অনুভূতির বিকাশের মধ্যে। আল্লাহকে গ্রহণ করে সার্বক্ষণিক তৃপ্তি এবং প্রেমের পরিপূর্ণতাই কামনা করতে হবে।

একজন দরবেশ সম্পর্কে গল্প আছে— 'তিনি তাইগ্রিস নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন। নদীতীরের একজন লোক দেখলো যে তিনি সাঁতরাতে পারছেন না, হাবুডুবু খাচ্ছেন। সে তখন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি কাউকে ডেকে আনবো আপনাকে তুলে

www.nagorikpathagar.org

আনার জন্য? দরবেশ উত্তর করলেন, না। লোকটি তখন প্রশ্ন করলো, আপনি কি তাহলে ডুবে যেতে চান? তিনি বললেন, না। লোকটি বিস্মিত হলো, তাহলে আপনার ইচ্ছা কি? দরবেশ উত্তর করলেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে, আমার ইচ্ছা করবার কিছু নেই।'

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় যে চিত্তপ্রসাদ, রূপকচ্ছলে সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু জ্ঞানের সাহায্যে নয়, বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে নয়, নির্ভরতা ও বিশ্বাসের সাহায্যে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হতে হবে, সুতরাং সূফী সাধকগণ আল্লাহকে অনুভব করার চেষ্টা করেন আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহর কাছ থেকেই তারা পথের সন্ধান করেন আল্লাহর পথেই প্রত্যাবর্তনের জন্য। আত্মাকে খেদমত বা সেবার আবরণ পরিয়ে আল্লাহ বলেন— 'তখন তুমি স্বাধীন ছিলে, তোমার বুদ্ধি এবং নানাবিধ গুণাবলী দ্বারা তুমি আচ্ছন্ন ছিলে, বুদ্ধি এবং সর্ববিধ গুণাবলী যখন অন্তর্হিত হলো, তখন তুমি বুদ্ধি ও স্বেচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অপারগ হলে এবং এ অপারগতাই অবশেষে তোমাকে জয়ী করলো।' আল্লাহ মানুষকে প্রবুদ্ধ করেন তাঁকে জানতে তাঁরই সাহায্য নিয়ে।

যখন কেউ বলেন যে, তিনি একটি আকস্মিক অনুপ্রেরণায় আল্লাহকে অনুভব করেছেন তাহলে কথাটা দাঁড়ায় যে, অন্য একজনও বলতে পারেন তিনি তার অনুপ্রেরণায় আল্লাহকে অনুভব করেননি, শূন্যকে অনুভব করেছেন। তাহলে একটি কথা অন্য কথার বিপরীতে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহকে অনুপ্রেরণালব্ধ একটি অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা ত্রুটিপূর্ণ বলে সূফীরা মন্তব্য করেন। যিনি সর্বাংশের অধিকারী, যিনি বিপুল অনন্তকে তাঁর আজ্ঞায় পরিচালিত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থানের নিয়তি এবং তাৎপর্য যাঁর হাতে তিনিই তো পরম প্রভু বিধাতা। তাঁকে যুক্তির সাহায্যে নয়, ইলহাম বা অনুপ্রেরণার সাহায্যে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের নির্ভরতার সাহায্যে জানতে হবে।

যখন মানুষ জানে, সকল বস্তুর উপর অধিকার একমাত্র আল্লাহর এবং সকল কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, সুতরাং মানুষকে আত্মবোধ থেকে বিমুক্ত হয়ে এমনি একটি বোধে জাগ্রত হতে হবে, যেখানে সে আল্লাহর উপাসক। এভাবেই সূফীরা আত্মবোধ বিলুপ্ত করা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞায় আল্লাহর সান্নিধ্য উপনীত হন। এটা এমন একটি অস্তিত্ব যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, যুক্তির সাহায্যে বিবেচনা করা যায় না, যা শুধু একটি হাল বা অবস্থার স্বভাব বা প্রকৃতি। যেমন বৃক্ষলতা, যেমন প্রাণিকুল, যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন চাঞ্চল্য অথবা অবস্থা, তেমনি মানুষও আল্লাহর সেবার জন্য সৃষ্ট। অনন্তকাল ধরে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বৃক্ষলতা, প্রাণিকুল এবং মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত। এটি একটি বিস্ময়কর বিমুগ্ধ অনুভূতি, যা মানুষের সকল চৈতন্যকে বিলুপ্ত করে জাগরিত। সুতরাং বলা যায়, একটি বিপুল অনন্তের দায়ভাগে আমরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করছি, আমাদের সর্বচৈতন্যকে নিয়োজিত করছি এবং ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি পরম ও পরম নির্ভরতার বিধাতায় সান্নিধ্য যাঞ্ছা করছি।

www.nagorikpathagar.org

সকল আরম্ভের আরম্ভে

কোন কিছুর আরম্ভ কোথায় আর কোথায় বা শেষ তা আমরা জানি না। কোথায় কখন আরম্ভ হলো এবং কিভাবে তার সূচনা তা আমাদের প্রত্যক্ষে নেই। মানুষের সর্বপ্রকার কর্ম একটি বিরাট ধারাক্রমের অংশ। এ ধারাক্রমটি সতত প্রবাহমান এবং সতত সঙ্গত। একটি বীজ বপন করা হলো সেটাই কি বৃক্ষ উদগমের সূচনা, না বৃক্ষে যখন ফল ধরে তখনই তার সূচনা? বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন কি তা নতুন করে প্রবাহিত হয়, নাকি অনন্ত প্রবাহের একটি বিচলিত মুহূর্তে আমরা তার সাড়া পাই?

এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমরা করে যেতে পারি, কিন্তু এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সমগ্র সৃষ্টি একটি আবর্তিত সত্তা– এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। কেননা সর্বক্ষণের আবর্তনে কোন উৎসমুখ চিহ্নিতরূপে ধরা পড়ে না। আমরা যদি সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে সর্বদাই এর সম্মুখ যাত্রার তরঙ্গিত গতিবেগই লক্ষ্য করব। কোথাও এর স্তব্ধতা পাব না, কোথাও সুচিহ্নিত সূচনা পাব না।

সরহপা তাঁর একটি দোহা নিবন্ধে বলেছেন— 'সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে যায়, সেখানে সে মেঘ হয়। সেই মেঘ আবার বিগলিত হয়ে সমুদ্রেই পতিত হয়।' এভাবে মানুষ সদা-সর্বদা একটি চক্রের মধ্যে বাস করছে। এভাবে কোন কিছুর আরম্ভ নেই, কোন কিছুর শেষ নেই— একটি সতত সর্বসত্তায় সমস্ত সৃষ্টি বিদ্যমান পাব, সূচনা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা জানি যে একজন মানুষের জীবন শেষ হয়, কিন্তু এ-ও জানি যে, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন মানুষের জীবন আরম্ভ হয়। এরকম আরম্ভ এবং শেষ পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত যে, আমরা কোন আরম্ভকে আরম্ভ বলতে পারি না। কোন শেষকে শেষ বলতে পারি না।

কিন্তু সকল আরম্ভেরই একটি আরম্ভ আছে। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সরলতার মধ্যে সেই আরম্ভের মূলীভূত শক্তিকে আমরা আবিষ্কার করতে চাই। এ শক্তি সর্বত্রই আছে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে আছে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যেই আছে। এই একক এবং অনন্ত অসীম আমাদেরকে অবারিত রেখেছে। আমরা এই একক এবং অনন্ত-অসীমের স্পর্শে গলিত, উজ্জীবিত, আনন্দিত এবং চৈতন্যময়। সে জন্যই বলা হয়েছে আমরা যখনই কেবল কিছু করব তখন শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁর নাম উচ্চারণ করব। এ উচ্চারণের কারণ হলো আমার কর্মধারাকে বিশ্বাস করা এবং সঞ্জীবিত করা। এই উচ্চারণটি কোন প্রথা নয়। কিন্তু যে অনন্ত অধিকারের দ্বারা আমরা চৈতন্যময় সেই অনন্ত অধিকারকে স্বীকার করা।

আমরা যখন একটি বৃক্ষ বপন করি তখন তার জন্য সজীবতা প্রার্থনা করি। আমরা চাই বৃক্ষের উদগম যেন শুভ হয় এবং পরিণতকালে তা যেন ফুলে-ফলে সমাবৃত হয়। আমরা তাই বলি— 'হে প্রভু! তুমি অপার করুণাময়, তুমি অশেষ দয়ালু, তোমার নামে বৃক্ষ বপন করলাম। এর ফলবানতায় আমরা যেন উপকৃত হই।' জীবনের সকল কর্মে এ প্রার্থনার সুযোগ আছে এবং প্রয়োজন আছে।

আমরা যখন আমাদের গৃহ থেকে বাইরে পা বাড়াই, তখন যাত্রা শুভ হোক তা আমরা

www.nagorikpathagar.org

চাই এবং কল্যাণের মধ্যে যেন প্রত্যাবর্তন করতে পারি এ ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগে। তাই আমরা বলি— 'হে প্রভু, তোমার নামে পা বাড়িয়েছি। তোমার বিশুদ্ধতার মহিমায় আমার যাত্রা যেন শুভ হয় এবং আমি যেন কল্যাণের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর অর্থই হচ্ছে, সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি অসীম করুণাময় এবং পরম দয়ালু।

একসময় অন্ধকার যুগে মূর্তিপূজকদের অভ্যেস ছিল প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে তারা তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করত। কিন্তু যেদিন থেকে সৃষ্টিকর্তার অনন্ত স্বরূপ মানুষের একমাত্র উপলব্ধির উৎস হলো তখন শুদ্ধতার জন্য, বিনয়ের জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং আনন্দের জন্য 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি সকল আরম্ভের আরম্ভ হলো। কোরআন শরীফে বহুস্থানে উপদেশ রয়েছে, প্রত্যেক কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে আরম্ভ করে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে, প্রদীপ নেভাতেও 'বিসমিল্লাহ' বলবে, পাত্র আবৃত করতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে, কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওজু করতে, বাইরে বেরোবার সংকল্প করার সময়, সওয়ারীতে আরোহণ ও তা থেকে অবতরণ করলেও 'বিসমিল্লাহ' বলবে,। অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' হচ্ছে সকল আরম্ভের আরম্ভ।

আমরা তো অনন্তকে অনুধাবন করতে পারি না। আমরা তো সৃষ্টির সূচনাকে চিহ্নিত করতে পারি না, কিন্তু আমরা তো আমাদের সকল কর্মের প্রয়াসকে চিহ্নিত করতে পারি। 'বিসমিল্লাহ'র সাহায্যে আমরা অনন্তের দায় দাতাকে মান্য করি এবং অভিভূত হয়ে বিশ্বাস করি, আমরা যা আরম্ভ করলাম সেটা অনন্ত ধারারই একটি অংশ। নদীতে নৌকা করে যখন যাব, বিমানে আরোহণ করে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যাব যখন গতি পাব; অশ্বপৃষ্ঠে দীর্ঘপথ যখন অতিক্রম করতে চাইব তখনও আমরা অনন্তধারার মধ্যেই গতিমান। এটা যাতে বিস্মৃত না হই সে জন্য 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করা আমাদের কর্তব্য।

রাসূলে খোদার একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন— 'বিসমিল্লাহ' আয়াতটি যখন পাঠ করা হয় তখন পূর্বদিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে যায়, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত হয়ে ওঠে, জন্তুগুলো কান পেতে মনোযোগসহকারে শুনতে থাকে, আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তানকে বিতাড়ন করে এবং বিশ্বপ্রভু স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেন 'যে বস্তুর উপর আমার নাম নেয়া হবে তাতে অবশ্যই বরকত হবে।'

বর্ণনাটি রূপক। এর তাৎপর্য হচ্ছে; সকল সফল অধিকার, অনন্তের সর্বপ্রকার বিস্মৃতি এবং অস্তিত্বের সকল প্রকার মহিমা আমাদের অনুভব করতে হবে আমাদের পরিচ্ছন্ন জীবন যাত্রার প্রয়োজনে। পৃথিবীতে কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, এর রেখা হারিয়ে যায় না, শীতলতা এবং উষ্ণতা হারিয়ে যায় না, শব্দের প্রত্যয় হারিয়ে যায় না এবং এসব কিছুই থাকে অনন্তের অধিকারের প্রয়োজনে। এই অনন্তের অধিকারকে মান্য করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

সকাল বেলা যখন সূর্য ওঠে এবং পাখি আনন্দে কলরব করে ওঠে তখন উষালগ্নের বিভূতি আমাদের জীবনকে উৎসাহিত করে। এই উৎসাহের জন্য বিশ্বপ্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলব— 'হে প্রভু! তুমি সকল আরম্ভের আরম্ভ। তোমার নাম উচ্চারণ করে আমি পরিচ্ছন্ন হতে চাই।'

যেসব প্রাণী এবং পক্ষী খাদ্য হিসেবে আমাদের জন্য সমর্থিত সেসব প্রাণীকে জবাই

www.nagorikpathagar.org

বা নিহত করবার মুহূর্তে আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয় পবিত্রতার অঙ্গীকারস্বরূপ এবং বিশ্বপ্রভুর সর্ব মুহূর্তের উপস্থিতির দাবিতে। এরমধ্যে সৌজন্যবোধ, বিনয় ও পবিত্রতার শিক্ষা রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন— 'নবুয়ত প্রাপ্তির পর একদিন মুহাম্মদ (সাঃ) বালদাহ নামক এলাকার শেষপ্রান্তে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়েলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সামনে খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করা হয়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গোশত ছিল। নবী (সাঃ) গোশতের পেয়ালাটি তাঁর সামনে থেকে সরিয়ে ইবনে আমরের সম্মুখে ঠেলে দিলেন এবং বললেন, কুরাইশগণ, আপনারা আপনাদের নামে পশু জবাই করে থাকেন, তাই আমি তা খেতে পারি না। আল্লাহর নামে জবাই করা ছাড়া কোন গোশত আমি খাই না।'

ইবনে আমর রাসূলের নির্দেশকে মেনে নিলেন এবং তারপর থেকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার রীতিকে ঘৃণা করতে লাগলেন। রাসূলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বলতেন— 'যে প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যাদের জন্য তৃণগুল্ম জমিনে উৎপাদন করেছেন আল্লাহ, যাদের আলো দিয়েছেন তিনি এবং বাতাস দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কারও নামে নিহত করা অসম্ভব রকম অপরাধ। এ অপরাধের ক্ষমা নেই।'

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারব। পৃথিবীতে বসবাসের জন্য জীবন ধারণের জন্য যে বিপুল সমারোহ আমাদের জন্য রয়েছে তার জন্য যদি বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাহলে আমাদের চিন্তা পরিচ্ছন্ন হবে এবং জীবন থেকে অস্বস্তি দূর হবে।

রূপকচ্ছলে বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর বৃক্ষলতা, তৃণ-গুচ্ছ, কীট-পতঙ্গ, পানির প্রবাহ, আলোর বন্যা, বাতাসের গতিবিধি– এসব কিছু সকল মুহূর্তে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে থাকে। ও উচ্চারণ আমরা শুনি না এটা সত্য, কিন্তু অনুভব করবার চেষ্টা করতে পারি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিধানটি একজন সৃষ্টিকর্তার প্রসন্নতার কথা বলে। যাঁরা কোন কিছুকেই বিশ্বাস করে না, তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটি প্রবল অস্তিত্বের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই সচল এবং সজীব রয়েছে। চতুর্দিক দৃষ্টিপাত করে, যে বিচিত্র বর্ণবিভা আমরা লক্ষ্য করি সে বর্ণবিভাও বিধাতার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। আমরা কখনও কোন মুহূর্তে একাকী নই। আমরা আমাদের বিধাতার সম্মুখে বিদ্যমান, তাঁরই প্রশ্রয়ে লালিত এবং তাঁরই নির্দেশনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে। বিধাতার অস্তিত্বের জন্য এবং তাঁর অনুকম্পার জন্য আমাদের একটি মাত্র মহান উচ্চারণ রয়েছে— 'আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। তিনি পরম করুণাময় এবং অশেষ দয়ালু।'

খ্রীষ্টানদের মধ্যে শুধুমাত্র খাদ্য গ্রহণের প্রাক্কালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি আছে। কিন্তু এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সকল কর্মের ক্ষেত্রে নেই। কর্মজগতে খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় বাস্তববাদী এবং বৈজ্ঞানিক কুশলতায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, আধুনিক সময়ের অভিভাষণ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা। ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত কবি ধীরেন্দ্র একসময়ে খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি যীশুর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতেন এবং বাইবেলকে আদর্শ হিসেবে ভাবতেন। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে মানুষ বৈজ্ঞানিক অহংকারে উদ্ধত, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ধর্মের নীতিকে অস্বীকার করছে। তখন তার চৈতন্য হলো। তিনি শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণের পূর্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রথা অস্বীকার করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে

www.nagorikpathagar.org

সকল মুহূর্তে বিধাতার আশীর্বাদকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ইসলামে সকল কিছু আরম্ভের আরম্ভে আল্লাহর নাম স্মরণের যে রীতি আছে সেটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। সেটি একটি অস্তিত্ব এবং উপলব্ধির শিক্ষা। এই শিক্ষায় একটি স্বীকৃতি আমরা সর্বমুহূর্তে প্রদান করি তা হচ্ছে— 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই। তিনি প্রথম ও শেষ, আদি ও অনন্ত, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, চূড়ান্ত আদেশ প্রদান তাঁরই এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাব।'

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-নামল-এর মধ্যে এক জায়গায় হযরত সোলায়মানের প্রেরিত একটি রীতিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কথাটি বসিয়েছেন। সাবাহ রানীকে সোলায়মান একটি পত্র প্রেরণ করে তাকে ঔদ্ধত্য পরিহার করতে বলেছিলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথা বলেছিলেন এবং এই লিখনের সূচনায় তিনি আল্লাহর নাম নিয়েছিলেন। এভাবেই আমরা সকল কর্মের সূচনাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণের অধিকার পেয়েছি।

হযরত সোলায়মান একজন মহা প্রতাপশালী সাহসী বীর ছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর। তিনি সংস্কৃতবান, স্থপতি ছিলেন, সৌন্দর্য-পিপাসু ছিলেন। তাঁর বীরত্ব এবং সাহসিকতা তাঁকে উগ্র করেনি, বরং বিনয়ী করেছে। তিনি তাই সকল কর্মের সূচনায়, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছেন। সেদিন থেকে বিশ্বাসীদের জন্য সকল কর্মের সূচনালগ্নে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা একটি বিধিবদ্ধ সততসিদ্ধ রীতিতে পরিণত হয়। মিথ্যা যেন কখনও আমাদের নিকটে না আসে এবং অসৌজন্য যেন কখনও আমাদের মলিন না করে সেজন্যই আমরা সকল কর্মের সূচনাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে থাকি। কোরআন শরীফের সকল সূরার প্রারম্ভে এ কথা বলতেই হয় যে, আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। রাসূলে খোদা নিজে একবার তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার মতো আয়াত হযরত সোলায়মান ছাড়া অন্য কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতটি হলো– 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।'

জিবরাঈল (আঃ) প্রথম যখন রাসূলুল্লাহর নিকটে ওহী নিয়ে এসেছিলেন সেখানে আল্লাহর নামে পাঠ করবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল— 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা' অর্থাৎ পাঠ করুণ আপনার পালনকর্তার নামে। সুতরাং পাঠ করা এবং পাঠ গ্রহণ করা মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল। জীবনের সত্য অন্বেষণের জন্য মানুষের যে অনুক্ষণ চেষ্টা, সে চেষ্টার সফলতা তখনই আসবে যখন আমাদের মহাপ্রভুকে সেই চেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত করব। মানুষ তো একাকী কিছু করতে পারে না। মানুষের সর্বকর্মের পিছনে আল্লাহর নির্দেশ আছে, অবশ্য অপরাধের পথে মানুষ যখন পা বাড়ায় তখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেই যায়। সেজন্য কর্মের শুদ্ধতার প্রয়োজনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা বিধেয়।

নীল আমর্স্টংকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'আপনি যখন চাঁদে পা রাখলেন তখন আপনি কি নিজেকে গর্বিত ভেবেছিলেন?'

উত্তরে আমর্স্টং বলেছিলেন— 'আমি তখন অসহায় বোধ করেছিলাম, আমি বিধাতার অনন্ত ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং মানুষ যে কত ক্ষুদ্র তা বুঝতে পেরেছিলাম।'

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তীতে নীল আমর্স্টং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমাদের রাসূল প্রতিটি পদক্ষেপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর অসীম ঘোষণা করতেন। আমাদের জীবন তখনই পূর্ণ হবে যখন আল্লাহর করুণা আচ্ছাদিত হবে। আমাদের জন্ম, জীবন এবং অবস্থা সবই আল্লাহর জন্য। আমাদের জীবনকালটা আল্লাহর সমর্থনের জন্যই নিবেদিত যিনি আমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা এবং আকাশকে আচ্ছাদনস্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি থেকে বারি বর্ষণ করেন। বারি বর্ষণের ফলে সিক্ত ভূমিতে আমাদের জন্য উপজীবিকাস্বরূপ ফলজুঞ্জ উৎপাদন করেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করে সকল কর্মের সূচনা করাই তো আমাদের কর্তব্য। এজন্যই একজন বিশ্বাসীর জীবনে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' এর গুরুত্ব অপরিসীম।

একজন সূফীকে তার শিষ্যরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি এবং প্রাণিকুল সর্বদাই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছে আপনি বলে থাকেন, তার প্রমাণ কি?" সূফী উত্তর করলেন, "তুমি কি সকালবেলা বায়ু প্রবাহের শব্দ শোন না? গাছের পাতার শিহরণ কি তোমার চোখে পড়ে না? নদীর গতিবেগের ধ্বনি শোন না? এগুলো সবই তো আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে চলেছে।" এভাবে যদি আমরা ভাবি তো অপরাধ কি? পূর্ব এবং পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ যে দিকেই আমরা মুখ ফেরাই না কেন সেদিকেই আমরা আল্লাহর চেহারা দেখতে পাব। কেননা আল্লাহ সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী এবং পূর্ণ জ্ঞানবান।

আমাদের জীবন একটি লক্ষ্যহীন কোলাহল নয়, যেহেতু আমাদের মৃত্যু আছে। তাই বলে জীবন তাৎপর্যহীন নয়। বরঞ্চ মৃত্যু আছে বলেই জীবন মূল্যবান এবং ধ্বংস আছে বলেই সৃষ্টির তাৎপর্য উদ্ভাসিত। আমরা কিন্তু শূন্যতার মধ্যে বাস করি না। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হচ্ছে পৃথিবীর সকল কিছুই হারিয়ে যাবে এবং তবুও এসকল কিছুকে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের জীবন অর্থহীন নয়, আমাদের জীবন আবার সুনিশ্চয় নয়, কিন্তু তবু আমাদের জীবন মূল্যবান জীবন। কেননা বিধাতার স্পর্শ নিয়েই এজীবন সমৃদ্ধ নয়। পৃথিবীর এই স্পর্শের কথা স্মরণ করে এবং সমর্থনের কথা স্মরণ আমরা সর্বমুহূর্তে তাঁর নাম উচ্চারণ করব যেন আমাদের অনুভূতিতে বিকলতা না আসতে পারে, বিসংবাদ না আসতে পারে এবং অশুদ্ধতা না আসতে পারে। যেহেতু তিনি সর্বমুহূর্তে বিদ্যমান, সুতরাং তিনি আমাদের সম্মুখে আছেন। আমাদের পশ্চাতে আছেন, আমাদের ইচ্ছায় আছেন, আমাদের জিজ্ঞাসায় আছেন এবং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আছেন। সুতরাং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সার্বক্ষণিক গতিবিধিতে তাঁর নাম উচ্চারণ করব। কেননা তিনিই যে একমাত্র মহাপ্রভু, পরম করুণাময় এবং অশেষ দয়ালু।

www.nagorikpathagar.org

কবি আল্লামা ইকবাল এবং তাঁর 'আসরার-ই খুদী'

অস্তিত্ব কি এবং আত্মাই বা কি– এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। তার কারণ, অস্তিত্ব বা আত্মা এ দুটি শব্দের সীমাবদ্ধতা আছে। পৃথিবীতে আমাদের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটে সে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সীমায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি বস্তুর অথবা প্রতিটি অভিজ্ঞানের অথবা প্রতিটি বোধের আপনাপন সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু কোন কিছুই একটি সামগ্রিক চেতনায় বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমগ্র বা এ্যাবসলিউট হচ্ছে সকল অস্তিত্বের একটি একীভূত ব্যঞ্জনা। এই একীভূত ব্যঞ্জনা একটি একক সৃষ্টি করে এবং সে এককের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থাৎ সেই একক তাঁর সীমাবোধকে এবং চিহ্নিতকরণকে হারিয়ে ফেলে। তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, যদি সমগ্র বোধের কোন সীমা না থাকে তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর বা অভিজ্ঞতার কেন সীমা থাকবে?

সীমার বোধটি হচ্ছে এক প্রকার মানসিক বোধ। যথার্থরূপে সসীম বলে কিছুই নেই। আমরা পৃথিবীতে যাকে বাস্তব বলি সে বাস্তবের কোন একক সত্তা নেই। একটি বাস্তব অন্য বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত। পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পরগত একটি বয়ন আছে। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অথবা বিশ্বভূমার কল্পনা যখন করি তখন তা বিভিন্ন বাস্তবের মধ্যে দিয়েই করি। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুলনারহিত এবং সীমাসংবদ্ধ নয়, সুতরাং প্রতিটি জীবন নিজস্ব এককতায় পরিস্ফুট হয়েও অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যথার্থ বাস্তব কাকে বলে তার পরীক্ষা করা খুবই কঠিন। আমরা শুধু সংক্ষেপে এ কথা বলতে পারি, বাস্তব হচ্ছে একটা সম্পর্ক— বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক, বোধের সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক, ইচ্ছার সঙ্গে প্রত্যয়ের সম্পর্ক। এভাবে চিন্তা করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি, এ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার নয়। আমরা অনবরত অগ্রসর হচ্ছি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায়, বিশৃংখলা থেকে বোধে এবং কল্পনা থেকে প্রত্যয়ে। আমরা প্রত্যেকেই এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অংশভাগী। এ মুহূর্তে যেসব মানুষ পৃথিবীতে আছে তারাই কিন্তু সমগ্র মানব জাতি নয়। নতুন মানুষ পৃথিবীতে অনবরত আসছে এবং এভাবে অনন্তকাল ধরে সৃষ্টিকর্মে সকল মানুষই অংশ নিয়ে চলেছে। পৃথিবী সর্বদাই এক ধরনের পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিপূর্ণায়ন কখনও সম্পূর্ণ হচ্ছে না। সুতরাং আমরা কখনও একথা বলতে পারি না যে, পৃথিবীর একটা সমগ্র সত্য রূপ ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। এটা গড়ে ওঠার সাথে এবং সব সময় গড়ে ওঠার পথেই থাকবে। সৃষ্টিকর্মের ধারায় আমরা সকলেই অংশ নিচ্ছি। পবিত্র কোরআন শরীফে এ কথাই বলা হয়েছে— 'আল্লাহ মহিমাময় এবং প্রশংসিত, যারা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

(কোরআন ২৩:১৪)

মানুষের এই যে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষমতা বা প্রবণতা, একেই রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন— 'তাখাল্লাকু বি আখলাক আল্লাহ।' অর্থাৎ আল্লাহর গুণে নিজেদেরকে

www.nagorikpathagar.org

গঠন করে নাও। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ অনন্যসাধারণ হচ্ছে আল্লাহর নিকটস্থ হবার চেষ্টায়।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে জীবন কি?

জীবন হচ্ছে অস্তিত্বের এককতা এবং এই অস্তিত্বের মহোত্তম বিকাশে যে আত্মবোধের প্রকাশ দেখি সেটি হচ্ছে 'খুদী' বা অহং। একটি পরিপূর্ণ চিৎপ্রকর্ষে এই অহং একটি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং আত্মসম্পূর্ণতা লাভ করে। এই আত্মসম্পূর্ণতা কিন্তু কোনদিনই আত্মসম্পূর্ণতা নয়। আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের দূরত্ব যখন খুব বেশি থাকে তখন সে পরিপূর্ণ হয় না। মানুষ যখন আল্লাহর নিকটস্থ হয় তখন সে পরিপূর্ণতার দিকে যায়। মাওলানা রুমী তাঁর মসনভী'তে এ বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী বলেছেন :

"রাসূলে খোদা তাঁর বালক অবস্থায় একবার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ধাত্রী হালিমা দুঃখে ব্যাকুল হয়ে যখন তাঁর অনুসন্ধান করছিলেন তখন তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, দুঃখ করো না, সে তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না। অন্য দিকে সমস্ত পৃথিবী তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাবে।'

যথার্থ একক সত্তা কখনই পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে না। মূলত পৃথিবীই তার মধ্যে হারিয়ে যায়।

যথার্থ সত্যসন্ধানী পুরুষ বস্তুজগতকে নিজের মধ্যে যে ধারণ করে তাই নয়, এর উপর অধিকারও বিস্তার করে। সেই মহান প্রভু আল্লাহকেও তার অহং চৈতন্যের মধ্যে নিয়ে আসে।

কবি ইকবাল তাঁর 'আসরার-ই খুদী' কাব্যগ্রন্থে মানবসত্তার অহং-চৈতন্যের বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসরার-ই খুদী প্রথম প্রকাশিত হয় লাহোরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি একটি আকস্মিক কাব্য-প্রেরণার ফল নয়। ইকবাল প্রাচ্য দর্শন, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানও তিনি আহরণ করেছিলেন। তিনি জার্মানীর মিউনিখ এবং ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর গবেষণায় সফলকাম হয়েছিলেন। এ গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি পারসিক অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে। এ সময় থেকেই তিনি একটি নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তুলতে থাকেন।

আসরার-ই খুদী কবি'র জীবন-দর্শনের পরিচয় বহন করছে। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার, আসরার-ই খুদী কোন দার্শনিক নিবন্ধ নয়, এটি একটি কবিতা। এতে তিনি তাঁর জীবন এবং অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণাকে বিভিন্ন কাব্য-রূপকের মাধ্যমে এ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। যেহেতু আসরার-ই খুদী একটি কাব্যগ্রন্থ, সুতরাং কবি তাঁর কাব্যবোধের সাহায্যে তাঁর পাঠককে তাঁর প্রত্যয়ের বৃত্তে নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ইকবাল একজন সাধারণ মাপের কবি ছিলেন না, তাই শুধু যুক্তি-তর্কের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান না করে তিনি কাব্যগত পারসুয়েশনের সাহায্যে তা করেছেন।

আমি পারসুয়েশন শব্দটি ব্যবহার করলাম ইচ্ছা করে। এটাকে ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে এক প্রকার চৈতন্যের দ্বার উদঘাটন। ইকবাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন— 'আজকের দিনের শ্রবণের কোন প্রয়োজন নেই, আমি হচ্ছি আগামী দিনের কণ্ঠস্বর।'

তিনি আরও বলছেন— 'আমি পথভ্রান্তকে গৃহে প্রত্যাগমনের সুযোগ করে দিতে চাই এবং অলস দর্শককে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আমি একটি উষ্ণ অভিযাত্রায়

www.nagorikpathagar.org

নতুন অন্বেষণে অগ্রসর হতে চাই। আমি পরিচিত হতে চাই নতুন প্রাণ-চৈতন্যের ঘোষণাকারী হিসেবে।'

জীবনের মৌলিক প্রবৃত্তি হচ্ছে অগ্রসরমানতা। সম্মুখে গমনের পথে যত বাধাই আসুক না কেন, সেসব বাধাকে জীবন উৎপাটন করে অথবা নিজের অন্তর্গত করে। অন্তর্গত করার অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা অথবা বলা যেতে পারে আত্মবোধের মধ্যে নিমজ্জিত করা। জীবন তার সম্মুখযাত্রায় বাসনার জন্ম দেয়, আদর্শের জন্ম দেয় এবং আপন সুরক্ষার জন্য বুদ্ধি, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকরণেরও জন্ম দেয়। এ সময় প্রকরণ জীবনকে তার মর্যাদায় অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বদা সাহায্য করে।

খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা অনুভব করতে পারব যে, জীবনের অগ্রযাত্রার পথে বাধা হচ্ছে বস্তু অথবা বস্তুর স্বভাব। কিন্তু যাকে যাকে আমরা বস্তু অথবা বস্তুর স্বভাব বলছি তা কিন্তু পাপ কিংবা পরাজয় নয়, তা মানুষকে আকর্ষণ করে এবং আচ্ছন্ন করে। এবং এই আচ্ছন্নতা ও আকর্ষণের কারণে জীবন এমন একটি শক্তি লাভ করে, যে শক্তির সাহায্যে মানুষ সকল প্রকরণকে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেয়। মানুষের যে অহংবোধ আছে, যাকে আমরা আত্মবোধ বলতে পারি, সেটা কিন্তু সর্বাংশে স্বাধীন নয়, সেটি অংশত স্বাধীন এবং অংশত সুনির্দিষ্ট। এই আত্মবোধটি তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে যখন তা আল্লাহর অস্তিত্বে অনন্ত চৈতন্যে বিলীন হবে।

ইকবাল তাঁর আসরার-ই খুদীতে মানুষের অহংবোধ বা আত্মবোধের এই স্বাধীনতার কথাই বলেছেন। তিনি আসরার-ই খুদীর আরম্ভে বলছেন— 'যখন বিশ্ব-বিমোহনকারী উজ্জ্বল সূর্য রাত্রির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একটি প্রবল দস্যুর মতো, তখন আমার ক্রন্দনে গোলাপের পাঁপড়ি নিষিক্ত হলো। আমার অশ্রু নার্গিস ফুলের অক্ষিকোটর থেকে নিদ্রা ধুয়ে ফেললো এবং আমার আবেগ কিশলয়কে জাগ্রত করল এবং প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করল, উদ্যান-পালক আমার সঙ্গীতের ক্ষমতা পরীক্ষা করল। সে আমার কবিতাকে বপন করল এবং সেখান থেকে তরবাকীর জন্ম হলো। আমার অশ্রুর বীজকণাগুলো সে মৃত্তিকায় বপন করল। এবং আমার আর্তনাদকে সে উদ্যানের লতা-গুল্মের সঙ্গে বয়ন করল, যেমন করে কাপড় বয়ন করা হয়। যদিও আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তবু উজ্জ্বল দেদীপ্যমান সূর্য আমারই। আমার বৃক্ষের নিবিড়ে একশত উষা অবস্থান করে। জামসিদের পানপাত্রের চাইতে আমার ধূলিকণা উজ্জ্বল। আমার ধূলিকণা সে সমস্ত বস্তুকেও জানে যেগুলো এখনও জন্মলাভ করেনি।'

এভাবে প্রস্তাবনা করে ইকবাল তাঁর 'আসরার-ই খুদী'তে আপন অভিপ্রায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। ইকবালের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে, গভীর দর্শন আছে, কিন্তু আবেগ এবং কল্পনার উদ্দীপনা এমন একটি বিস্ময় সৃষ্টি করে যে, আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি, তাঁর বক্তব্যকে প্রশ্ন করি না, বরঞ্চ গ্রহণ করি। যখন আসরার-ই খুদী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ভারতের মুসলমান যুবসমাজ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে এ বাণীকে গ্রহণ করেছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, ইকবাল এক মহান বাণীবাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মৃতকেও যেন প্রাণ দিয়েছেন। ইকবাল একজন আদর্শ মানুষের সন্ধানে ছিলেন, যে মানুষ বিশ্বকে অকল্যাণ থেকে, অব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেবে। সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়ে এই আদর্শের পরিচয় ইকবাল আমাদের সামনে চিত্রিত করেছেন।

ইকবাল আত্মবোধসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান সেই মানুষের কল্পনা করেছেন, যে মানুষ তিনটি

www.nagorikpathagar.org

অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে পূর্ণকাম হবে। এই তিনটি অবস্থা হচ্ছে :

(১) আল্লাহর আইনের শাসন মান্য করা;

(২) অহংবোধের চরমতম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য আত্মসংযম এবং

(৩) আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ্'র খলিফা হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন।

আল্লাহ্র নায়েব মানুষ তখনই হতে পারে যখন সে সর্বদিক দিয়ে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হবে। এই সম্পন্নতা এবং সম্পূর্ণতা হচ্ছে দেহ এবং মননের সমন্বিত বোধ এবং আমাদের মানসলোকের বিভিন্ন বিক্ষুব্ধতার মধ্যে সুর-সমন্বয়। সেই ব্যক্তিই মহোত্তম শক্তি অর্জন করতে পারেন যিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে থাকেন। একজন পূর্ণকামী মানুষ তার জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে, আবেগ এবং প্রজ্ঞায় একটি সমন্বিত অস্তিত্ব লাভ করেন। ইকবালের ভাষায় সেই মহৎ ব্যক্তি হচ্ছে মানব-বৃক্ষের সর্বশেষ পরিপক্ক ফল।

আসরার-ই খুদী'র প্রথম অধ্যায়ে কবি বলছেন— 'অস্তিত্বের স্বরূপ হচ্ছে আত্মবোধের একটি প্রকাশ, তুমি যা কিছু দর্শন করো, সে সব কিছুই হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার গোপন মাধুর্য। যখন ব্যক্তিসত্তা পূর্ণ চৈতন্যে প্রকাশিত হলো, তখন তা চিন্তার বিচিত্র ভূমাকে প্রকাশ করল। বহুশত বাণীর রহস্য তার গভীরে লুকিয়ে আছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা অনাত্মকে চিহ্নিত করতে পারি এবং এভাবে ব্যক্তিসত্তা তার বিরোধী সত্তাকেও প্রকাশ করে। সে নিজেকে একান্ত একক বলে ভাবে না, নিজেকে নিজের অতিরিক্ত বলে ভাবে। সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বের জন্ম দেয়, কেননা সে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আনন্দ নির্মাণ করতে চায়। এটা এক ধরনের হত্যা, যার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তা আপন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। এভাবে জীবনের সারবস্তুকে আমরা সংগ্রহ করি আত্মবিকীরণের মধ্যে যেমন করে গোলাপ ফুল আলোর রক্তে স্নান করে নিজেকে পরিস্ফুট করে। একটি রক্তিম গোলাপের জন্য অনেক উদ্যান ধ্বংস করতে হয় এবং বহু সব আর্তনাদের মধ্য দিয়ে একটি সুরসাম্য নির্মিত হয়, একটি মাত্র আকাশের জন্য একশটি চন্দ্র জাগ্রত করে, এবং একটি মাত্র শব্দের জন্য একশত সংলাপ নির্মাণ করে।'

উপরের কথাগুলো ইকবালের ভাষণের গদ্য রূপান্তর। একসময় এ ভাষণকে আমি ছন্দে রূপান্তরিত করেছিলাম, সে উদাহরণটি নিচে উপস্থিত করছি :

'আপনাকে হত্যা করা আপনার হাতে সেই তো শক্তির লভ্য জীবনের ব্যাপ্ত আঙ্গিনাতে অনুভব করে নেয়া আপনার সামর্থ্য-নিচয় আনন্দের আলোকের, সত্যসন্ধ জীবনের সেই হলো নব পরিচয়। জীবনের তথ্য পায় আপনারে কবি প্রবঞ্চনা। গোলাপের মতো গড়ে রক্তিম আলোকে তার জীবনের প্রমুক্ত-কল্পনা। একটি গোলাপ লাগি ভেঙ্গে ফেলে উদ্যানের পূর্ণাঙ্গ আস্বাদ, একটি সুরের লাগি আদি পথে গড়া হয় বহু আর্তনাদ। একটি আকাশ লাগি কত না নতুন চাঁদ গড়া হয় নতুন প্রভায়, সহস্র বিতর্কজাল শুধু এক সঙ্গহীন বাণীর সহায়। কেন এই অপব্যয়– নিষ্ঠুর ধরার মাঝে ব্যথার সঞ্চয়– ধ্বংসের সংকট গড়ে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের নব পরিচয়।'

কবি ইকবাল তাঁর আসরার-ই খুদী মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর 'মসনবী'র ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যের প্রস্তাবনায় জালালউদ্দিন রুমীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি সত্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বেদনা-বিষাদে এক রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। তখন তিনি একটি কল্যাণময় মধুর স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন যে, সত্যের গৃহীতা মাওলানা রুমী, তিনি ইরানী ভাষায় ফোরকান রচনা করেছেন, তিনি তাকে তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তুললেন এবং বললেন :

'হে প্রেমিক নবীন প্রভাতে
প্রেমের অমৃতে পূর্ণ পাত্র তুমি লও হাতে।
হৃদয়ের সব গান এক তানে কল্লোলিয়া তুলুক উল্লাস।
একটি আঘাতে শুধু হৃদয়তন্ত্রীতে তব জাগুক উচ্ছ্বাস
পাত্রের কার্নিস যেন আঘাত আঁকিয়া দেয় মস্তকে তোমার
অক্ষির সান্নিধ্য তব দীপ্ত হোক বাঁকা তলোয়ার।
তোমার হাসির আলো উৎস হোক বহু বেদনার
তোমার চোখের পানি রক্তাক্ত করিয়া দিক অন্তর সবার।
ঘুমন্ত কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল?
প্রমুক্ত গোলাপ সব ব্যর্থভাবে উড়াইবে সৌরভ অতুল!
ব্যথায় মুমূর্ষ হয়ে বাক্যহীন রহিয়াছ তুমি!
রক্তিম আঙ্গারে জ্বলি চঞ্চল হউক আজি তব মনভূমি।
শান্তিরে লাঞ্ছিত করি কলকণ্ঠে জানাও বারতা
দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে জানাইবে অন্তরের তীব্র আকুলতা।
পুঞ্জীভূত আঙ্গারের তুমি দীপ্ত-প্রাণ
পৃথিবীতে প্রশস্ত হউক আলোর সন্ধান।'

কবি ইকবাল সূফীদের আত্মবিলোপে বিশ্বাস করতেন না, যাকে বলে 'ফানাফিল্লাহ'। সত্তা বিলোপের যে ব্যঞ্জনার কথা তিনি বলেছেন সেটি হচ্ছে অজস্রকে আত্মবোধের মধ্যে বিনিঃশেষ করে এমন একটি অহংবোধের প্রকাশ ঘটানো, যে প্রকাশ হবে আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধির। মাওলানা রুমী যেভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার কথা বলেছিলেন, সে বিলীনতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা একেবারেই থাকবে না। ইকবাল রুমীর সে তত্ত্বকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি রুমীর মহত্ত্বে এবং কাব্যগত তাৎপর্যে বিমুগ্ধ ছিলেন, তাই তিনি রুমীর রচনা-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিনিঃশেষ সাধনাকে গ্রহণ করেননি। ইকবাল যে জীবন দর্শন উপস্থিত করেছেন সে জীবন দর্শন হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ। যে ধর্মীয় আদর্শ জীবনকে কৃষিক্ষেত্র বলেছে। অর্থাৎ এ পৃথিবীকে অস্বীকার করে নয়, বরং পৃথিবীর কর্মকে শুভ ও কল্যাণমুখী করে মানুষ তার 'খুদী' বা ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে। এই সম্প্রসারণের মধ্যেই ইকবালের আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা। ইকবাল কঠিন একটি দর্শনকে আনন্দবোধের দর্শনে পরিণত করেছেন, একটি অসাধারণ প্রজ্ঞাকে আবেগের উচ্চারণ করেছেন এবং মানুষের অস্তিত্বকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর দর্শন বিনিঃশেষের দর্শন নয়, বরঞ্চ আত্মপ্রকাশের দর্শন, আত্মবিলুপ্তির দর্শন নয়, বরঞ্চ সকল সংকটের মধ্যে আত্মআবিষ্কারের দর্শন। যে মহান স্রষ্টা একক ও অদ্বিতীয়, তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই সম্পূর্ণতার মধ্যে অবগাহন করার প্রচণ্ড ইচ্ছায় যে চৈতন্যের জন্ম হয়েছে সেই চৈতন্যই হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তা বা আত্মবোধের চৈতন্য।

www.nagorikpathagar.org

সকল প্রশংসা তাঁরই

॥ ১ ॥

অলৌকিকতা কাকে বলে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। যেখানে প্রাণকণার অস্তিত্বই অলৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা বিশ্লেষিত হয় না, যেখানে বিরাট মহাশূন্যের সকল তাৎপর্যই অনির্ণেয় সেখানে অসম্ভব বলে কোন কিছুই অস্বীকার করা চলে না। কোরান শরীফে আছে, আসফ বিন বারখিয়া চোখের পলক পড়ার সময়ের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসন সোলায়মানের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

মরিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাকারিয়া (আঃ) যখনই তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেন শীত ঋতুর ফল দেখতেন গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্ম ঋতুর ফল দেখতেন শীতকালে। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো— 'আপনি এগুলো কি করে পেলেন?'

তিনি উত্তর করলেন— 'এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।'

কোরান শরীফে আসহাবে-কাহাফের গল্পে বলা হয়েছে কি করে বহুকাল তারা গুহার অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে ছিল এবং তাদের কুকুর তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। এ সমস্ত কেরামত বহুবিধ রূপকগত তাৎপর্য নিয়ে বিদ্যমান। মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং নিঃশংসয় বিশ্বাসে আল্লাহর সর্বপ্রকার ক্ষমতাকে গ্রাহ্য করা।

'হাদিস-উল ঘার' বা গুহা সংক্রান্ত একটি হাদিস আছে। উক্ত হাদিসে আছে, একবার সাহাবীরা প্রাচীনকালের মানুষ সম্পর্কে রসূলের কাছে উল্লেখযোগ্য বিবরণ শুনতে চেয়েছিলেন।

রসূল (সাঃ) বলেছিলেন— 'একবার তিন ব্যক্তি দুর্গম পথযাত্রায় অগ্রসর হয়েছিল। সন্ধ্যার সমাগম দেখে তারা একটি গুহায় রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নিল। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আকস্মাৎ পাহাড় থেকে বিরাট একখণ্ড পাথর পড়ে গুহায় মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, আমরা আমাদের জীবনে যদি কোন স্বার্থহীন কাজ করে থাকি, তবে সে কাজের বিবরণ এখন দেবো এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো যেন তিনি সে কাজের জন্য আমাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি দেন। এভাবে একজন বললো, আমার বৃদ্ধ মা-বাবা ছিলেন। আমার একটি ছাগী ছাড়া আর কোন সম্পদ ছিল না। আমি বনে কাঠ কুড়িয়ে সেগুলো বিক্রি করে বাবা-মার খাবার যোগাতাম, আর ছাগলের দুধ তাদের খেতে দিতাম। একদিন কাঠ বিক্রি করে খাবার আনতে দেরি হয়ে যায়। ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে বাবা-মার ঘরে গিয়ে দেখি তারা ঘুমিয়ে আছেন। সারারাত আমি তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। সকাল বেলা তারা জেগে উঠলে তাদের হাতে দুধের পেয়ালা দিলাম। এ কাজে যদি কোন পুণ্য থাকে, তবে আল্লাহ যেন তার কারণে আমাদের মুক্তি দেন।

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখের পাথরটি একটু সরলো কিন্তু পুরোপুরি সরলো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমি একটি অপূর্ব যৌবনবতী অন্ধ বালিকা দেখেছিলাম যাকে উপভোগ করার ইচ্ছা আমার জেগেছিলো। তাকে আমি ১২০ দিনার দিয়ে বলেছিলাম, তুমি রাত্রে আমার কক্ষে আসবে। সে যখন এলো তখন আমি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তার কাছ

www.nagorikpathagar.org

থেকে সরে গেলাম। যে অর্থ তাকে দিয়েছিলাম তা-ও ফেরত নিলাম না।

উক্ত কথা বলে লোকটি প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ, আমার এ আচরণ যদি শুভ নিমিত্তের হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মুক্তি দাও।

তখন পাথরটি আরও একটু সরলো। কিন্তু পুরোপুরি গুহামুখ উন্মুক্ত হলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার অধীনে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করতো। দিনের কাজ শেষ হলে সন্ধ্যার লগ্নে তারা তাদের প্রাপ্য ভাতা নিয়ে বাড়ী যেত। একদিন একজন শ্রমিক ভাতা নিতে এলো না। এরপরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সে তার প্রাপ্য নিতে না আসায় তার টাকায় একটি ভেড়ী কিনলাম। ক্রমান্বয়ে সেই একটি ভেড়ী থেকে একপাল ভেড়া-ভেড়ী গড়ে উঠলো। কয়েক বছর পর লোকটি এসে তার ভাতা চাইলো। আমি তখন বললাম, যাও ঐ মাঠে যতগুলি ভেড়া-ভেড়ী আছে সবই তোমার। তোমার প্রাপ্য টাকা থেকেই ঐগুলোর উদ্ভব হয়েছে। আমি সন্তুষ্টচিত্তে সবকটি প্রাণী তাকে দিয়ে দিলাম।

উক্ত কথা বলে লোকটি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ! আমি যদি সত্য বলে থাকি তাহলে তুমি আমাদের মুক্তি দাও।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি গুহার মুখ থেকে সম্পূর্ণ সরে গেল। এবং লোকগুলো গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লো।'

উক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য অলৌকিতা প্রতিপাদন করা নয়, কিন্তু মানব হিতৈষণাকে সম্মান করা। রসূলে খোদা বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ যদি ন্যায়বান হয়, অন্যের উপকার করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পিতামাতার সেবা করে তাহলে সে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবে। একজনের কল্যাণ কর্মের ফলস্বরূপ যদি অলৌকিক কিছু ঘটে, তবে সেখানে অলৌকিকতার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না; সেখানে কল্যাণ কর্মের সমর্থন পাচ্ছি।

উক্ত হাদিসে আর একটি জিনিস প্রমাণি হচ্ছে, আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী কেউ নেই। বিপদগ্রস্ত মানুষ সংকটের মুহূর্তে প্রার্থনার জন্য হাত তুলবে একমাত্র আল্লাহর কাছে এবং প্রত্যাশার জন্যও হাত তুলবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই। তাহলেই তার সংকট বিমোচিত হবে। আমাদের জীবনে আমরা লক্ষ্য করি মানুষ প্রত্যাশার হাত বাড়ায় মানুষের কাছে। কেননা সে ভাবে তার চেয়ে উন্নত পর্যায়ের যে ব্যক্তি নিকটে আছে সে হয়তো তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু এটা কখনই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক মানুষ তা সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক, শক্তিবান অথবা দুর্বল হোক, মূলত অত্যন্ত অসহায়। তার অসহায়তা দূর করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ।

সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো— 'হে কল্যাণময় প্রভু,! তুমি আমাদের সমৃদ্ধি দাও, হে অনন্ত শক্তিধর বিধাতা। তুমি সকল বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো, হে পরম প্রিয় মহাপ্রভু! তুমি আমাদের চিত্তে শান্তি দাও, স্বস্তি দাও।'

আবু সায়ীদ খাররাজ একজন খ্যাতনামা সূফী ছিলেন। তিনি বলেছেন— খাদ্যসামগ্রী যাতে কম গ্রহণ করতে হয় সেজন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম। অভ্যেস করেছিলাম তিনদিনে একবার মাত্র আহার্য গ্রহণ করবার। আমি একবার এক মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনদিনের দিন আমি ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়ি। এ ক্ষুধা আমি যখন খুব তীব্রভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করি তখন মনে হলো শূন্য থেকে কে যেন বলছে, তুমি কি আহার্য চাও, যা তোমার রিপুর নিবৃত্তি ঘটাবে? না তুমি তোমার দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে চাও?

www.nagorikpathagar.org

আমি উত্তর করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শক্তি দাও। এরপর আমি খাদ্য ছাড়াই অনেক দূর পথ হাঁটতে সক্ষম হয়েছিলাম।'

উক্ত কাহিনীতে একটি প্রতীকগত ব্যঞ্জনা আছে।

॥ ২ ॥

আমরা খাদ্য গ্রহণ করি প্রাণ ধারণের জন্য এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। খাদ্যের জন্যই খাদ্য গ্রহণ করি না। সুতরাং শক্তি সঞ্চারের এবং জীবনকে চলমান রাখবার জন্য যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন ততটুকুই আমরা গ্রহণ করবো, এর অতিরিক্ত নয়। অনেক গৃহে খাদ্য হচ্ছে বিলাসের উপকরণ। ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের অহমিকা প্রকাশ করবার জন্য বিবিধ খাদ্য পরিবেশন করা হয়। এর ফলে আমরা ক্রমান্বয়ে মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ি এবং অলৌকিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হই। একারণেই সূফী সাধক বলেছেন— হে প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, হে প্রভু আমাকে তোমার প্রয়োজনে জীবন্ত রাখো, হে প্রভু, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার আমাকে দাও। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছো সে জীবনের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই আমি সর্বক্ষণ তোমার অভিপ্রায়কে যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি, এ ক্ষমতা আমাকে দাও।'

এ কারণেই খাদ্য গ্রহণ করার পূর্বে প্রার্থনা করার বিধি আছে, যেমন মুসলমান সমাজে আছে তেমনি খ্রীষ্টান ও ইহুদী সমাজে আছে। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা কৃতজ্ঞতায় বিশ্ব প্রভুর বশংবদ হই।

সন্তুষ্টি কাকে বলে? সন্তুষ্টি তো চিত্তের একটি অবস্থা। এ অবস্থা অর্জন করতে হয়।

কথিত আছে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন— 'হে আল্লাহ, এমন একটি কর্মের নির্দেশ আমাকে দাও যা সম্পাদন করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে।'

আল্লাহ উত্তর করলেন— 'হে মুসা, তুমি তা পারবে না।'

মূসা তখন ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সর্বসময় নিযুক্ত রাখলেন।

আল্লাহ তখন বললেন— 'হে ইমরানের সন্তান, আমার যা আদেশ সে আদেশে যদি তুমি সন্তুষ্টি থাক তাহলেই আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো।'

একজন সূফীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— 'কোনটি ভালো, ত্যাগ না সন্তুষ্টি?'

সূফী বলেছিলেন— 'সন্তুষ্টি।' কেননা আল্লাহ একজনকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সে অবস্থায় কেউ যদি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার উচ্চাভিলাষ থাকে না, সে তৃপ্তিতে নিমজ্জমান থাকে এবং স্বস্তি নির্মাণ করে। মনে রাখতে হবে, আমরা যখন সর্বস্ব ত্যাগের বাসনা করি তখন কিন্তু আমাদের চিত্তে একটি প্রত্যাশা থাকে। আমরা মনে করি এভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারলে বিধাতা আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আমাদের জীবনে কল্যাণ আসবে। সুতরাং ত্যাগ চরমতম অবস্থা নয়, ত্যাগ হচ্ছে সোপান মাত্র। কিন্তু সন্তুষ্টি হচ্ছে একটি চরমতম অবস্থা। সন্তুষ্টিই হচ্ছে একটি সিদ্ধি, সন্তুষ্টের উর্ধ্বে আর কিছু নেই।

অন্য একজন সূফী বলেছেন— 'সন্তুষ্টি হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন।'

দুঃখে কাতর হবো না, বেদনায় জর্জরিত হবো না, ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হবো না, শুধুমাত্র সন্তুষ্টিতে আমাদের প্রহরগুলিকে উজ্জ্বল রাখবো, এটাই প্রত্যেক মানুষের কাম্য হওয়া

www.nagorikpathagar.org

উচিত। পৃথিবীতে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমরা কিন্তু এক বিপুল পরিতৃপ্তির মধ্যে বাস করি। আলো আছে, বাতাস আছে, সবুজ পাতা আছে, শীতলতা, স্নিগ্ধতা আছে এবং উষ্ণতার দীপ্তি আছে। প্রত্যেক মানুষ সর্বমুহূর্তে এ সমস্ত আনন্দের অভিবাদনের মধ্যে বাস করে। সুতরাং সে কেন সন্তুষ্ট থাকবে না? সুতরাং আমাদের সর্বমুহূর্তে প্রার্থনা হবে— 'হে বিধাতা, আমাকে তুমি যা দিয়েছো তাই আমার জন্য যথেষ্ট, তাতেই আমি পরম পরিতৃপ্ত। যদি আরও কিছু দিতে হয় তবে সেটাই আমাকে দেবে, যা আমার জন্য কল্যাণপ্রদ। সন্তুষ্টির প্রাসাদে আমরা যেন সর্বমুহূর্তে অভিষিক্ত হই এই আমার আকুল কামনা।'

তৃপ্তির যথার্থ স্বরূপ কি? তৃপ্তি দু'প্রকারের বলে সূফী সাধকগণ উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, মানুষের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি মানুষের সন্তুষ্টি তৃপ্তির এ দুটি প্রকৃতিই আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রকাশ পায় আল্লাহর ইচ্ছায় যখন মানুষ তার সকল কল্যাণাশ্রয়ী কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আল্লাহর কারামতি তার উপর বর্ষিত হয়। মানুষের সন্তুষ্টি প্রকাশিত হয় আল্লাহর নির্দেশ পালন করার মধ্যে এবং সর্বাংশে তা মান্য করার মধ্যে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি না জাগলে মানুষের সন্তুষ্টি জাগবে না অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সকল সন্তুষ্টির পূর্বশর্ত। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে মানুষ কখনই আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত প্রাণ হতে পারে না। ভাগ্যকে মান্য করা, যে অবস্থাকে সূফীরা বলে থাকেন 'ইস্‌তি ওয়ায়ি দিল' সন্তুষ্টির প্রথম সোপান। আল্লাহর ক্রোধ আসুক, ধ্বংসের অনিবার্যতা প্রকাশ পাক, সকল অবস্থাতেই যিনি ভাগ্যের নির্দেশের অসম্মাননা করেন না অর্থাৎ যিনি প্রশ্ন করেন না তিনিই সন্তুষ্টিকে প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে আবুজর গিফারী বলতেন— 'আমি ঐশ্বর্যের চেয়ে দারিদ্রকে বেশি ভালোবাসি এবং অসুস্থতাকে সুস্বাস্থ্যের চেয়ে।'

উক্ত কথার অর্থ হচ্ছে, যদি আমি দরিদ্র হই তবে তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো এবং যদি অসুস্থ হই তবে অসুস্থতায় ক্ষুব্ধ হব না। অর্থাৎ সকল অবস্থাকেই আল্লাহর নির্দেশিত বলে গ্রহণ করবো। অথবা বলব আল্লাহ আমার জন্য যা নির্বাচন করেছেন তাই আমি সন্তুষ্টচিত্তে মান্য করবো। এ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আমি আল্লাহর 'হুজুরে' বা সম্মুখে থাকবো। তাই সদাসর্বদা আল্লাহকে সম্মুখে রাখার সাধনা করতে হবে। এটাই হচ্ছে মুক্তির পথ যাকে সূফীরা বলেন 'রাহানিদান।'

॥ ৩ ॥

মানুষ কোন্‌টাকে অধিকতর বাঞ্ছিত মনে করে— আত্মতৃপ্তি সাধনকে, না অপরের তৃপ্তি সাধনকে? পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত ব্যক্তিগত সম্ভোগ এবং তৃপ্তির কথাই ভাবে, কিন্তু সূফীরা অপরের হিতৈষণার কথাই ভাবেন, আত্মহিতৈষণার কথা নয়।

কোরান শরীফে আছে— 'যদিও তারা দরিদ্র এবং প্রাপ্তির অধিকারী ছিল, কিন্তু তারা নিজের প্রয়োজনের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে মান্য করেছিল।'

উক্ত কথাগুলো এসেছে রসূলের সে সব সাহাবী বা সঙ্গী সম্পর্কে যারা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যারা কখনই প্রত্যাশার হাত বাড়াননি, বরং আপন প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে অন্যের প্রয়োজন সাধনের কথা ভেবেছেন। ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে 'প্রেফারেন্স' (Preference) যাকে বাংলাতে বলা যায় 'বাঞ্ছিত' বা 'বৃতি', তা কি করে নির্ধারণ করা যায়?

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারণ করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সে অধিকারকে সম্মান করা। অর্থাৎ আপন প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে বন্ধুর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করা এবং আপন ইচ্ছাকে অবদমিত করে অন্যের ইচ্ছাকে সফলকাম করা। এ সফলকাম করার পিছনে কোরানের একটি বাণীকে কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে— 'যা ন্যায়সঙ্গত তা সম্পন্ন করার আদেশ প্রদান করো এবং অজ্ঞানীর কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন কর।'

বাঞ্ছিত কর্ম এবং কাম্য সাধন দু প্রকারের— প্রথমত সঙ্গী বা সহচরের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া; দ্বিতীয়তঃ যার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং প্রেম আছে তাকে উৎফুল্ল করা এবং তাকে কৃতার্থ করা। অতীতে গোলাম অলখালিল বলে এক লোকসম্পন্ন এবং শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন যার কথা 'কাশফুল মাহজুব'-এ উল্লেখ আছে। তিনি সূফীদের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন— 'সূফীরা অপর ধর্মের পোশাক।'

তার নির্দেশে 'নূরী রাক্কান' এবং 'আবু হামযা' নামক তিনজন সূফীকে বন্দী করা হয় এবং ধর্ম বিরোধিতার অভিযোগে খলিফার দরবারে অভিযুক্ত করা হয়।

খলিফা তাদেরকে 'জানাদিকা' বা 'অপধর্মের পোশাক' বলে সাব্যস্ত করে ফাঁসীর হুকুম দেন।

জল্লাদ যখন রাক্কানকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে তখন নূরী বললেন, তাকে যেন রাক্কানের আগে ফাঁসী দেয়া হয়।

তার এ অনুরোধে সবাই অবাক হলো। জল্লাদ বললো— 'হে যুবক, এত আগ্রহের সঙ্গে তুমি কেন মৃত্যুকে প্রত্যাশা করছো? তোমার সময় তো এখন আসেনি?'

নূরী উত্তর করলেন— 'আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে, কিন্তু আমি আমার ভ্রাতাকে কিছুটা সময় আরও পৃথিবীতে বাঁচতে দিতে চাই। আমি মনে করি পৃথিবীর একটি মুহূর্ত পরকালের সহস্র বৎসরের সমান। পৃথিবী হচ্ছে খেদমতের জায়গা এবং পরকাল হচ্ছে কুরবাৎ বা নৈকট্যের জায়গা। খেদমত না করলে নৈকট্য পাওয়া যায় না।'

নূরীর কথায় খলিফা মুগ্ধ হলেন। তিনি তখন ফাঁসীর হুকুম স্থগিত রেখে প্রধান কাজীকে সমগ্র বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বললেন। কাজী জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

নূরী কাজীকে বললেন— 'আল্লাহর অনেক বান্দাহ বা দাসানুদাস আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর মাধ্যমেই সবকিছু করে। তারা আহার্য গ্রহণ করে আল্লাহর মাধ্যমে, পান করে তারই কৃপায়, আসীন হয় অথবা চলমান হয় তাঁরই নির্দেশে এবং জীবিত জীবন যাপন করে আল্লাহরই ধ্যানে। যদি এ ধ্যানরত অবস্থা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে তাদের অন্তরাত্মা বেদনায় আর্তনাদ করে উঠবে।'

কাজী তার কথায় অভিভূত হয়ে খলিফাকে লিখলেন— 'যদি সূফীরা অপধর্মের পোশাক হয় এবং আল্লাহর অংশীদারিত্ব করে বলে আমরা মনে করি তাহলে একেশ্বরবাদী হিসেবে কাকে আমরা গণ্য করবো?'

খলিফা তাদের সবাইকে তার দরবারে উপস্থিত করলেন এবং বললেন— 'আপনারা কিছু সাহায্য প্রার্থনা করুন, যদি আপনাদের জন্য আমি কিছু করতে পারি, আমি কৃতার্থ হবো।'

তারা উত্তর করলেন— 'আমরা চাই আপনি যেন আমাদের ভুলে যান। আমরা আপনার প্রিয়পাত্র-ও হতে চাই না; অপ্রিয়ভাজনও হতে চাই না। কেননা আপনার সন্তুষ্টি

www.nagorikpathagar.org

এবং অসন্তুষ্টি উভয়ই আমাদের জন্য সমান।' এ কথায় খলিফা ক্রন্দন করলেন এবং সম্মানের সঙ্গে তাদের বিদায় দিলেন।

নফী নামক একজন হাদিসবেত্তা বলেছেন বলে কথিত আছে— 'হজরত উমরের পুত্র ইবনে উমর আমার কাছে মাছ খেতে চেয়েছিলেন। আমি সমস্ত শহরে অনুসন্ধান করে অনেকদিন পর একটি মাছ পেলাম। আমি মাছটি সুস্বাদুভাবে রান্না করে ইবনে উমরের সামনে উপস্থিত করতেই তিনি খুবই খুশি হলেন মনে হলো, কিন্তু এমন সময় এক ভিখারী এসে কিছু যাঞ্ছা করলো। ইবনে উমর মাছটি ভিখারীকে দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। পাচক বললেন, প্রভু আপনি মাছ খেতে চেয়েছিলেন তাই বহু কষ্ট করে মাছ সংগ্রহ করে আপনার জন্য রান্না করা হয়েছে। আপনি বরং ভিখারীকে অন্য কিছু দিন।

ইবনে উমর বললেন, এ মাছ এখন আমার জন্য হারাম। আমি রাসূলের একটি হাদিসকে অনুসরণ করি, যেখানে বলা হয়েছে যদি কারও চিত্তে কোন কিছু পাবার আকাঙ্খা জাগে, কিন্তু সে যদি আপন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটিয়ে অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।'

কথিত আছে, কখনও একসময়ে দশজন দরবেশ মরুভূমিতে পথ হারিয়েছিলেন। তারা খুবই তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। তাদের কাছে এক পেয়ালা পানি ছিল মাত্র। কিন্তু অন্যকে বঞ্চিত করে কেউ সে পানি পান করতে চাচ্ছিলেন না। এভাবে সকলেই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং একে একে নজন মৃত্যুমুখে পতিত হন। যিনি বেঁচে রইলেন তিনি পানি পান করলেন এবং শক্তি সঞ্চয় করে মরুভূমি থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন।

যারা তার আত্মরক্ষার বৃত্তান্ত শুনলো তাদের একজন বললো— 'আপনি তো পানি না-ও পান করতে পারতেন।

তিনি উত্তর করলেন— 'তা হলে আত্মহত্যা করা হতো এবং আল্লাহর কাছে আত্মহত্যাজনিত মহাপাপে আমি অভিযুক্ত হতাম।'

প্রশ্ন হলো— 'আপনার বন্ধুরা কি তাহলে আত্মহত্যা করেছেন?'

তিনি উত্তর করলেন— 'না। তারা প্রত্যেকেই আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপরের কল্যাণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর পানি পান করবার আইনত অধিকারী আমি হলাম।'

ওহোদের যুদ্ধে আহত মুসলমানগণ যখন পিপাসার্ত তখন প্রত্যেকেই আহত সঙ্গীর প্রয়োজনের কথা ভেবে পানি পান করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং শেষপর্যন্ত মারা গিয়েছেন। এখানে তারা অন্যের প্রত্যাশা এবং প্রয়োজনকে আপন প্রয়োজনের চেয়ে অধিক ভেবেছেন।

কোরান শরীফে আছে— 'তুমি কখনও ন্যায়পরায়ণ বলে গণ্য হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তোমার প্রিয় বস্তুকে দান করতে সক্ষম হও।'

॥ ৪ ॥

'নফস' বলে একটি শব্দ আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করি। শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তুর মূল তাৎপর্য এবং সত্তা। কিন্তু বহুদিনের প্রয়োগে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে শরীরগত বিকার যাকে আমরা 'রিপু' বলি অর্থাৎ সমস্ত পাপের উৎস। কেউ কেউ বলেন রিপু অর্থাৎ 'নফস' হচ্ছে শরীর মধ্যস্থ একটি উপাদান। আবার কেউ বলেন, রিপু হচ্ছে শরীরের

www.nagorikpathagar.org

কর্মসাধন সংক্রান্ত একটি গুণ।

যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রিপু হচ্ছে সমস্ত অন্যায় আচরণের কারণ এবং প্রেরণা। এ সমস্ত অন্যায় আচরণকে অহমিকা, ঈর্ষা, অসূয়া, ক্রোধ ও ঘৃণা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, যুক্তি এবং ধর্মীয় বিবেচনায় এ সমস্ত আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের সাহায্যেই এ সমস্ত আচরণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়— একেই আরবীতে বলা হয় 'রিয়াদাত' যাকে আমরা পাপ বলি। তার স্বরূপ প্রকাশিতরূপে জাজ্বল্যমান, কিন্তু উপরের যে সমস্ত আচরণের কথা বলা হলো সেগুলো হলো মানুষের অন্তর্লীন স্বভাব। অন্তর্লীন স্বভাবকে বহিঃপ্রকাশগত গুণাবলীর সাহায্য দূর করা যায় তেমনি আবার প্রকাশমান রিপুর কার্যকরণকে অন্তর্লীন গুণাবলীর সাহায্যে শোধন করা যায়। শয়তান এবং ফেরেশতা যেমন পাশাপাশিই থাকে তেমনি ন্যায় এবং অন্যায়ের ইচ্ছাও মানুষের চিত্তে পাশাপাশিই বাস করে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে একটিকে অবদমিত করে অন্যটিকে প্রবৃদ্ধ করা। মানুষের সাধনা হবে চিত্তের বিকার, দুর্বলতা এবং পাপাসক্তিকে শুভ এবং কল্যাণ কর্মের সাহায্যে বিনষ্ট করা। এভাবেই মানুষ আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, কোন গুণ বা আচরণের একটি উপকরণগত স্থিতি আছে, অর্থাৎ কোন গুণই মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং মানুষের নিম্নমানের স্বভাব বা আচরণ বা গুণাবলী জানতে হলে মানবদেহের সকল প্রক্রিয়াকে জানতে হবে। 'ইনসানিয়াৎ' যাকে আমরা বলি তা আছে তার কারণ মানবদেহ আছে। এ দেহের দুর্বলতা আকাঙ্ক্ষা এবং নিচ প্রবৃত্তিকে আমরা তখনই শাসন করতে পারবো যখন আমরা আমাদের দেহকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারবো।

আমরা আমাদের দেহের নশ্বরতা সম্পর্কে অবহিত হলেই আল্লাহর অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য হবে। রসূলে খোদা বলেছেন— 'যে নিজেকে জানে সে-ই আল্লাহকে জানে।' অর্থাৎ মানুষ যখন জানবে যে, সে একদিন নিশ্চিহ্ন হবে সে তখনই অনুভব করবে আল্লাহ অনন্ত শক্তির অধিকারী এবং সর্বকালে বিদ্যমান; যখন মানুষ জানবে যে, সে দাসানুদাস তখনই সে জানবে আল্লাহ তার প্রভু। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মচৈতন্যরহিত অর্থাৎ আপনাকে যে যথার্থরূপে জানে না সে পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান লাভে অসমর্থ হয়।

কেউ কেউ বলেন, মানব শরীর আত্মা বা রূহের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মাত্র এবং এ শরীরকে ধ্বংস থেকে বা তাবায়ী থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ তার জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে প্রয়োগ করবে। 'কাশফুল মাহজুব'-এ বলা হয়েছে, এহেন বিবেচনা যথার্থ নয়। কেননা একটি শরীর থেকে প্রাণ চলে গেলেও শরীরটি ইনসানই থাকে, শুধুমাত্র মানবসত্তার আধার বলে বিবেচিত হয় না। প্রথম পর্যায়ে একে বলি জীবিত মানুষ, শেষের পর্যায়ে বলি মৃত মানুষ।

কোরান শরীফে আছে— 'সময়ের পরিসরে এমন একটি সময় কি ছিল না যখন মানুষ কোনভাবেই উল্লেখ্য হবার যোগ্য হয়নি? 'অর্থাৎ আত্মার অনুপ্রবেশের পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা কোন স্মরণীয় অস্তিত্ব ছিল না।'

কোরান শরীফে আরও আছে— 'যারা আমাদের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে আমরা তাদেরকে আমাদের পথে টেনে আনবো।'

রসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন— 'তিনিই মুজাহিদ যিনি আল্লাহর জন্য নিজের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আপন রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।'

www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র বলেছেন— 'আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ থেকে বৃহত্তর জিহাদের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি।' যখন জিজ্ঞেস করা হলো— 'বৃহত্তর জিহাদ কি?' উত্তর হলো— 'আপন নফস বা রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম।'

এ সংগ্রামটি অন্তত কঠিন এবং বেদনাদায়ক। তার কারণ রিপু হচ্ছে মানব স্বভাবের একটি বৃত্তি। মানুষ তার স্বভাবের দাসত্বে যেভাবে আপন অজ্ঞাতসারে বন্দী রয়েছে তাতে তার পক্ষে আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই সূফী সাধকগণ আত্মনির্যাতনের পন্থা আবিষ্কার করেছেন। কেননা তারা মনে করেছেন রিপুকে অবদমিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মনির্যাতন।

কথিত আছে সহ্‌ল বিন আবদুল্লাহ্ তসতরী নামক একজন সূফী সারাজীবন রোজা রাখতেন এবং পনের দিন পর্যন্ত অভুক্ত থেকে রোজা ভাঙ্গতেন। আবার নতুন করে পনের দিনের জন্য রোজা আরম্ভ হতো। তিনি মুশাহাদাত বা ধ্যানের নিশ্চয়তার জন্য 'নফস' বা রিপুকে এভাবেই শাস্তি দিতেন। তিনি বলতেন— 'তুমি যদি এ পৃথিবীতে আল্লাহর জন্য সর্বপ্রকার যন্ত্রণাকে মান্য করো এবং রিপুকে কঠোর শাসনে রাখো তাহলে পরকালে তুমি আল্লাহর নৈকট্য পাবে। আত্মনির্যাতনের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার পন্থা আবিষ্কার করতে পারি।'

অবশ্য আত্মনির্যাতন করলেই যে মানুষ আল্লাহর নিকটে পৌছবে এমন কোন কথা নেই। আল্লাহর 'ফয্‌ল' না হলে অর্থাৎ আল্লাহর কৃপা না হলে কেউ আল্লাহর নৈকট্য পায় না। রিপুকে অবদমিত রাখা একটি সংশোধনী মাত্র, সিদ্ধি নয়। রসূলে খোদা বলেছেন— 'তুমি যে শুধুমাত্র তোমার কর্মের কারণেই মুক্তি পাবে এটা ঠিক নয়, যে পর্যন্ত না আল্লাহর করুণা তোমাকে স্পর্শ করছে সে পর্যন্ত তোমার মুক্তি নেই।'

কোরান শরীফের বাণী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য— 'আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করতে ইচ্ছা করেন তার হৃদয়কে তিনি উন্মুক্ত করেন ইসলাম গ্রহণের জন্য, কিন্তু যাকে তিনি বিপথগামী করতে চান তার হৃদয়কে তিনি সংকীর্ণ এবং সংকুচিত করেন।'

॥ ৫ ॥

আমাদের প্রবলতম শত্রু হচ্ছে আমাদের রিপু এবং এ রিপু কখনই নিশ্চিহ্ন হয় না, সর্বদাই আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে রিপুকে সংযত রাখা এবং রিপুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা রিপুর আচরণকে শাসন করতে পারি; তার গুণাবলীকে ধ্বংস করতে পারি, কিন্তু তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে পারি না।

একজন সূফী রূপকচ্ছলে বলেছেন— 'আমি আমার রিপুকে ইঁদুরের আকৃতিতে দেখেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কে? সে উত্তর করেছিলো, বেখোয়ালীর জন্য আমি ধ্বংস আনি। কেননা আমি তাকে পাপে প্ররোচিত করি; কিন্তু যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের জন্য মুক্তি আনি, কেননা আমি না থাকলে পুর্ণকর্মের গর্বে তারা অহমিকায় পূর্ণ হতো।'

মানুষের মধ্যে রিপুর বাসনা যেমন থাকে তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি থাকে। বাসনা মানুষকে অসৎকর্মে প্রবৃত্ত করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মানুষ সংযমী হয়। যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নেই সে মানুষ অসম্পূর্ণ। আবার যে রিপু বাসনাহীন সে রিপুও নিস্তেজ এবং অসম্পূর্ণ মানুষ সর্বমুহূর্তে বাসনা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরস্পর বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

বাস করে। যদি সে বুদ্ধি এবং বিবেচনাকে মান্য করে তাহলে সে বিশ্বাসকে আপন জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যদি সে আবেগ বা বাসনার দাবিকে মান্য করে তাহলে ত্রুটি এবং অবিশ্বাসের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। বাসনা মানুষকে প্রাপ্ত পথে টেনে নিয়ে যায়। বাসনা দু প্রকারের :

(১) যৌন কামনা ও দেহ উপভোগের লাস্য এবং (২) পার্থিব সম্পদ ও সম্মানের জন্য মোহগত আকর্ষণ।

যে ব্যক্তি কামনা এবং উপভোগ সন্ধান করে সে তার আসক্তি ক্ষেত্র খুঁজে নেয় এবং সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদের আকর্ষণে লুব্ধতায় ঘুরে বেড়ায় সে তো সমাজের মধ্যেই অবস্থান করে এবং অন্যকেও প্রভাবিত করে। এভাবে যারা রিপুর বাসনাকে প্রশমিত না করে তাকেই সর্বসময়ের অবলম্বন করে সে যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সে আল্লাহর কাছ থেকে অনবরত দূরে সরে যেতে থাকে।

একজন সূফী উপদেচ্ছলে বলেছেন— 'কতদিন তুমি মানুষের সন্ধানে থাকবে? যাও নিজেকে খুঁজে নাও এবং যখন তুমি নিজেকে পাবে নিজের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। মনে রাখবে বাসনার অনেক রং এবং পরিচ্ছদ। প্রতিদিন সে বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে মানুষকে হতবুদ্ধি করে এবং বিভ্রান্ত করে।'

শয়তান তখনই মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে যখন মানুষ পাপ এবং অন্যায়কে তার জীবনে মান্য করে নেয়। বাসনার কাছে মানুষ যখন আত্মবিসর্জন করে, তখন শয়তান সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসে এবং ক্রমশ তার চিত্তকে পুরোপুরি অধিকার করার চেষ্টা করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছেন— 'যথার্থই আমার দাসের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে গ্রহণ করেছে শয়তান তার নিকটে আসতে পারে না। শয়তান হচ্ছে মানবচিত্তের দুর্বলতা এবং রিপুর তাড়না। কামনার বিভিন্ন প্রকৃতি আছে এবং মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং স্নায়ুর সাহায্যে কামনার সম্পন্নতা ঘটে। চোখের কামনা ধরা পড়ে দৃষ্টিতে, কর্ণের শ্রবণ সাধনে, নাসিকার আঘ্রাণে, জিহ্বার শব্দ উচ্চারণে এবং স্বাদ গ্রহণে, শরীরের স্পর্শে এবং মনের চিন্তায়। আমাদের চেষ্টা এবং জীবনব্যাপী সাধনা হবে দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রবণকে অন্যায় শব্দাবলীর জন্য রুদ্ধ রাখা, জিহ্বাকে এবং বাসনাকে শাসনে রাখা, শরীরের স্পর্শকে পবিত্র রাখা এবং মনের চিন্তাকে নিষ্কলুষ রাখা।

রিপুকে মানুষ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, কিন্তু রিপুর অন্যায় কর্মবৃত্তি থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এ সমর্পণ অত্যন্ত কঠিন বস্তু, কেননা সমর্পণটি সর্বাংশে এবং সর্বতোভাবে দ্বিধামুক্ত হতে হবে। সংশয় যদি থাকে এবং বিচলিত চিত্ততা যদি থাকে তাহলে সমর্পণ খণ্ডিত হয় এবং অসম্পূর্ণ হয়।

বিধাতা তো সর্বস্বের অধিকারী, অনন্তের নিয়ন্তা, সর্বকালের অক্ষয় অস্তিত্ব, বিপুল সময় ও পরিসরের সুনিশ্চয়তা। সুতরাং বিধাতার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করে আমরা আমাদের অস্তিত্বেরই সমর্থন জানাই। আমরা প্রত্যেকেই যেমন এক একজন একক, তেমনি বিপুল সমগ্রতার অবিচল সম্পূর্ণের অংশ।

www.nagorikpathagar.org

॥ ৬ ॥

ন্যায়বিচারের যথাযথ নির্দেশ কোরান শরীফে আছে। যে সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করে বিচারের ব্যবস্থাপনার উল্লেখ কোরান শরীফে আছে সেগুলো হচ্ছে :

সমতা, অপক্ষপাত, কর্তব্য এবং বিশ্বাস।

সূরা আলে ইমরানে আছে— 'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; শেষ বিচারের দিনে অবশ্যই তুমি পূর্ণভাবে তোমার প্রাপ্য পাবে।'

একই সূরায় অন্যত্র আছে— 'কোনও পয়গম্বর প্রতারক হতে পারেন না; যারা প্রতারণা করেন তারা তাদের প্রতারণার ফলসম্ভার শেষ বিচারের দিনে উপস্থিত করবে; সেদিন প্রতিটি মানুষ পূর্ণভাবে তার প্রাপ্য পাবে এবং কারও প্রতি অবিচার হবে না।'

সূরা আন-নিসায় আছে :— 'নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি পিপিলিকার ওজনের পরিমাণ অন্যায়ও করেন না এবং কেউ যদি ভালো কাজ করে তা হলে তিনি তার প্রাপ্যকে দ্বিগুণ করবেন এবং আপন ভাণ্ডার থেকে প্রভূত ভাতা দেবেন।'

॥ ৭ ॥

আমার পিতাকে কখনও দুঃখ বা অসহায়তা প্রকাশ করতে দেখিনি। জ্ঞান হওয়া অবধি তাকে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি হিসেবেই আমি বিবেচনা করেছি। সংসারে অনটন হয়তো কখনও এসেছে, হয়তো দুঃখ এসেছে পরিজনের কারও বা কারও মৃত্যুরূপে, হয়তো অসহায়তার শিথিল বন্ধনে গৃহগত জনদের অভিযোগ ছিল, কিন্তু আমার পিতা নির্বিকল্প নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সজীব এবং সচল ছিলেন। বিধাতার উপর এমন অপরিসীম নির্ভরশীলতা তাকে সমস্ত বেদনা এবং বিকলতা বহন করবার শক্তি দিয়েছিল।

তিনি বলতেন— 'পৃথিবীতে আমাদের বসতিকাল স্বল্পক্ষণের সুতরাং এ সংকীর্ণ ক্ষুদ্র সময়টিকে দুর্ভাগ্যে ভারাক্রান্ত না করে স্বস্তিতে সহজ করার চেষ্টা করাই তো উচিত। যা কিছু ঘটে, আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, যত পরিবর্তন আসে তাঁরই নির্দেশে আসে, যত সমাপ্তি সবই তো তারই আনন্দে, সুতরাং দুঃখ কেন পাব? আমি তাই ভালোবাসাকে গ্রহণ করেছি। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী পরিজনকে ভালোবাসি, আল্লাহকে ভালোবাসার দায়ভাগে। এদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসি। সকল আনন্দ তাঁরই, কেননা সকল ব্যবস্থাপনা তো তাঁরই।'

বাবা সব সময় কঠিন বিছানায় শয়ন করতেন, কাঠের চৌকির উপর একটি পরিষ্কার চাদর পেতে একটি মাত্র শিয়রের বালিশে মাথা রেখে ঘুমাতেন। কি করে ঘুম আসতো, মাঝে মাঝে নিজের কাছেই প্রশ্ন করতাম। একবার চাকরি পেয়ে আমি একটি তোষক তৈরি করে দিয়েছিলাম। বাবা হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরদিন সকালে বলেছিলেন— 'আমার রাত্রে ঘুম হয়নি, আরামে আমার ঘুম হয় না। আমার কাঠের বিছানাই ভালো।'

তিনি বলতেন— 'কত লোক পথেঘাটে মাটিতে শুয়ে থাকে। তাদের সংখ্যাই তো পৃথিবীতে বেশি। তাদের স্বভাব আয়ত্ত করতে চাই। দুঃখের বরাভয় চাই। আনন্দের ঐশ্বর্য চাই না।'

আমার পিতার মধ্যে একটি চিরকালীন বৈরাগ্য ছিল। আমার মাতার ঐশ্বর্য ছিল। তা তিনি গ্রহণ করেননি। মা-ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পিতার সঙ্গী হয়েছিলেন। আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন যে,

www.nagorikpathagar.org

আমাদের শিক্ষার জন্যই তিনি গ্রামের বাড়ী ছেড়েছিলেন। এটা অংশত সত্য, কিন্তু সর্বাংশে নয়। তিনি চাইতেন সর্বোতোভাবে স্বামীর মতো হতে। তাই তার পাশে দাঁড়িয়ে সর্বদা তাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাদের উভয়েরই ত্যাগের অহমিকা ছিল না। একটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় জীবন যাপনের উদ্দেশ্য ছিল। যা নেই অথচ অন্যের কাছে তা পাবার ইচ্ছা ছিল না; যা আছে তার জন্য আল্লাহর কাছে সদাসর্বদা কৃতজ্ঞ থাকতেন। এ নিশ্চন্ততাই ছিল তাঁদের উভয়ের বৈভব।

আজ বহুদিন পর জীবনের সায়াহ্নে এসে 'কাশফুল মাহজুব' যখন পড়ছি, তখন বারবার তাদের কথা মনে পড়ছে। সূফীরা বলেন— 'আসক্তি নয়, নিরাসক্তি নয়; আগ্রহ নয়, অনাগ্রহ নয়— শুধুমাত্র দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা মানুষকে ভরসা দেয় এবং আনন্দিত বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দেয়।'

বাবা সূফী তত্ত্বে দীক্ষিত ছিলেন, কিন্তু সূফী সাধনমার্গে পা রাখেননি। তিনি সংসারের মধ্যে থেকে সংসারকে আঁকড়ে না ধরে সংসার যাপন করেছেন। ইংরেজীতে যাকে বলে 'Sobriety' এবং 'Composure' অর্থাৎ বিনয় এবং স্বস্তি, তাই তাঁর অবলম্বন ছিল। তিনি অধৈর্য হতেন না, শুধুমাত্র একদিন তাঁকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম মৃত্যু মুহূর্তে। সকলে যখন তার মুখে পানি দিচ্ছে— তখন তার চোখে অশ্রু দেখেছি। শেষ বিদায়ের মুহূর্তে একবিন্দু অশ্রুর সাহায্যে তিনি সকলের প্রতি ভালোবাসার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছিলেন।

সায়ীদ বিন আল মুসাব্বির একজন খ্যাতনামা সূফী সাধক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে মনে হতো তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ করেছেন, আবার কখনও মনে হতো তিনি দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন।

তিনি বলতেন— 'পৃথিবীকে ততটুকুই গ্রহণ করো যতটুকু গ্রহণ করলো তোমার ধর্ম এবং বিশ্বাস অকুণ্ঠ থাকে; অন্যপক্ষে এমনভাবে পৃথিবীকে গ্রহণ করবে না যাতে তোমার ধর্ম এবং বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়।' এভাবে বিচার করলে যে দারিদ্র ধর্মে বাধা সৃষ্টি করে না, সে দারিদ্র এমন ঐশ্বর্য থেকে অনেক মহৎ যে ঐশ্বর্য মানুষকে বিলাসে মত্ত করে।

তিনি একবার হজ্বে গিয়েছিলেন। তখন মক্কায় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো— 'আপনি এমন একটি আইনসঙ্গত ব্যবহারের কথা বলুন যেখানে আইন বিরোধী কিছুই নেই।'

তিনি বললেন— 'আল্লাহর প্রশংসা অথবা যিক্র হচ্ছে একমাত্র আইনসঙ্গত কর্ম যার মধ্যে আইনবিরোধিতা একেবারেই নেই— কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রশংসা আইন বিরোধী, কেননা সেখানে আইন অথবা নীতির সঙ্গতি নেই।'

॥ ৮ ॥

ইমাম আবু হানিফা তাঁর সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল না। অহমিকাশূন্য জ্ঞানতাপস আবু হানিফা সর্বদা সরকারী দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কারণ তিনি আপন সাধনায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকতে চাইতেন। তিনি একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং কখনও জনসান্নিধ্য পরিহার করে নির্জনতাকে কাম্য করেননি।

কথিত আছে, তিনি একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি রসূলের মাযার থেকে কিছু জিনিস নির্বাচন করে গ্রহণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত ভীত হয়ে তিনি মুহাম্মদ বিন সিরিনের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

মোহাম্মদ বিন সিরিন বললেন— 'আপনি রসূলে হাদিসের প্রধান প্রবক্তা হবেন এবং সুন্নাহর যথার্থতা বিচারের জন্য সর্বদা চেষ্টা করবেন।'

অন্য একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, রসূল তাঁকে বলছেন— 'আমার নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য তোমার জন্ম হয়েছে।'

তিনি ইব্রাহীম আদহাম এবং ফাযিল আয়াজের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

একবার খলিফা মনসুরের সময়ে কাযী নিয়োগের প্রশ্ন দেখা দিল। খলিফা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এ পদে একমাত্র আবু হানিফাকেই নিযুক্ত করবেন।

খলিফার দরবারে আবু হানিফা উপস্থিত হয়ে বললেন— 'হে ন্যায়বিচারক, আমি আরব নই, সুতরাং আরবদের গোত্র প্রধানেরা আমার বিচার মেনে নেবে না।'

মনসুর বললেন—'এ পদের জন্য বংশ অথবা জাতির প্রশ্ন ওঠে না। এ পদের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সে জ্ঞান একমাত্র আপনারই আছে।'

আবু হানিফা বললেন— 'আমি এ পদের অনুপযুক্ত। যদি আমার এ উক্তি সত্য হয়, তাহলে আপনি একজন অনুপযুক্তকে এ পদে নিয়োগ করতে পারেন না। আর যদি আমার উক্তি মিথ্যা হয়, তাহলে একজন মিথ্যাচারীকেও আপনি কাযীর পদে নিযুক্ত করতে পারেন না।' এভাবে কৌশলে আবু হানিফা সরকারী দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলেন।

কথিত আছে, 'দাউদ তাই' নামক একজন ব্যক্তি তার পাঠক্রম শেষ করে এবং উন্নত পর্যায়ের একজন জ্ঞানী হয়ে আবু হানিফার কাছে এলেন। বললেন— 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।'

ইমাম আবু হানিফা বললেন— 'তোমার শিক্ষাকে কর্মে রূপান্তরিত করো, কেননা যে শিক্ষায় প্রযুক্তি নেই, সে শিক্ষা আত্মবিহীন শরীরের মতো।'

ইমাম আবু হানিফা আরও বলেছেন— 'জ্ঞানের গরিমায় তৃপ্ত থাকা জ্ঞানের অপলাপ মাত্র। জ্ঞানের প্রয়োগেই সার্থকতা। অন্যকে জ্ঞানদান করলেই জ্ঞান সফল হয়।'

'বিশ্বাস' কি স্বতঃসিদ্ধ? বিশ্বাস কি স্বতঃপ্রকাশ? আমরা বিশ্বাসের অভিনয় করতে পারি, আমরা দুর্বিনয়কে চিত্তে লালন করে বাইরে সাধু সজ্জন সাজতে পারি, আমরা দৃশ্যমান রূপে জ্ঞানবান এবং সুশীল হতে পারি, যদিও অন্তরে হয়তো প্রবৃত্তি লালন করি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্য রূপের মাধ্যমে সভ্যতাকে যাচাই করা যায় না। পৃথিবীতে বঞ্চনার মৌনতা এবং নির্বাক অভিনয় আছে, যার ফলে যে বঞ্চনা করছে তাই হয়তো আমরা সজ্জন ভাবি। ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের কিছু প্রকাশ্য আচরণবিধি আছে যেগুলো সদা পালনীয় বলে গণ্য হয়ে এসেছে। পার্থিব কর্মক্ষেত্রে মানুষ যদি এ আচরণবিধিকে মান্য করে তাহলে কর্মকাণ্ডের পাপী ও মূল্যবান উভয়েই প্রকাশ্য আচরণবিধির কারণে ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং ধর্মের বাহ্যিক আচরণবিধির কারণে একজন মানুষ ধার্মিক বলে প্রতীয়মান হলেও যথার্থ ধার্মিক হয়তো সে নয়। আচরণবিধি একটি পালনীয় প্রথা, আচরণবিধি হৃদয়ের অভিপ্রায়ের প্রকাশ নয়। তাই মানুষকে তার কর্মকাণ্ডে, সত্য রক্ষার প্রচেষ্টায় সদ্বিবেচনায় আবিষ্কার করতে হবে। মাতা-পিতার প্রতি আচরণে, শিশুর কল্যাণ হস্ত-প্রসারণের মধ্যে, প্রতিবেশীর প্রতি সযত্নে সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে মনুষত্বের যথার্থ বিকাশ পায়, শুধুমাত্র ধর্মীয় আচরণবিধিতে নয়।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল— 'সত্যিকার মোমিন কে?'

তিনি উত্তর করেছিলেন— 'সত্যিকার মোমিন সহজে প্রকাশ্য নয়। প্রকাশ্য নামাজ-রোজার সাহায্যে মোমিনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোমিনের পরিচয় তার অন্তরের বিশ্বাসে যার অভিব্যক্তি ঘটে তার দৈনন্দিন কর্মে যেখানে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক, যেখানে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করছে না, যেখানে সে বিনয়কে প্রতিষ্ঠিত করছে।'

সুতরাং এ পৃথিবী আমাদের জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র। আমরা আমাদের পদচারণায়, ইচ্ছায়, বিবেচনায়, সততা ও সদ্বিবেচনায়, অহমিকা শূন্যতায় নিরাকাঙ্ক্ষায় আমাদের যথার্থ পরিচয়কে স্পষ্ট করি। স্বার্থবোধ আমাদের চিত্তকে মলিন করে, অন্যের জন্য সর্বস্বদানের ইচ্ছায় আমরা মহৎ হই এবং বিধাতার আশীর্বাদকে অনিবার্য করি।

॥ ৯ ॥

আবু আলী আল্ ফুযায়ের বিন আয়ায একজন খ্যাতনামা সূফী ছিলেন। একসময় তিনি দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু দরিদ্রদের প্রতি সর্বদাই দয়াদ্রচিত্ত ছিলেন। যে কাফেলায় রমণীরা থাকতো সে কাফেলা তিনি আক্রমণ করতেন না আবার আক্রান্ত পথচারীর সর্বস্বও অপহরণ করতেন না, কিছু সম্বল রেখে দিতেন।

একবার একজন ব্যবসায়ী তার সঙ্গের একটি উটের পিঠে একজন ক্বারীকে নিয়েছিলেন। ক্বারী কোরানের একটি আয়াত উচ্চস্বরে পাঠ করছিলো— 'যারা তোমরা বিশ্বাস করো তাদের জন্য আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন করার এখনও কি সময় হয়নি? তোমরা কি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করবে না?'

কোরানের উক্ত বাণী শুনে আয়াযের চিত্ত দ্রবীভূত হয়। তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এরপর তিনি মক্কা নগরীতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং অনেক জ্ঞানী ও সূফীদের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর কুফা নগরীতে এসে আবু হানিফার সান্নিধ্যে বসবাস করতে থাকেন।

তিনি বলতেন— 'যিনি আল্লাহকে জানেন যেভাবে তাঁকে জানা উচিত তিনি যথার্থ আল্লাহর উপাসনা করেন। যিনি আল্লাহকে জানেন তিনিই আল্লাহর মহত্ত্বের কথা জানেন। যিনি প্রেমিক তিনিই কেবল ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হন। এ পৃথিবী উন্মত্ততার ক্ষেত্র, এখানে উন্মাদরা বাস করে প্রভূত বন্ধন দশায়। কামনা এর পাপ হচ্ছে এই বন্ধন।'

একবার হারুন-আল-রশীদ মক্কায় গিয়েছিলেন। হজ্বব্রত পালনের শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন— 'এতদঞ্চলে আল্লাহর প্রিয়পাত্র কেউ আছে কি যার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারি?'

একজন বললো— 'এখানে একজন সাধু সজ্জন আছেন যাঁর নাম আবদ্ আল রাজ্জাক সানানী।'

হারুন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নানাবিধ আলোচনাশেষে জানতে চাইলেন তাঁর কোন ঋণ আছে কিনা। যখন শুনলেন আছে, তখন তিনি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন।

হারুন এর পর অন্য একজন সূফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনিও ঋণগ্রস্ত শুনে তারও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন। হারুণ তখন বললেন— 'আমি এদের চেয়েও মহৎ কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

www.nagorikpathagar.org

তিনি তখন আয়াযের কথা শুনলেন এবং আয়াযের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। আয়াজ তখন উচ্চস্বরে কোরান শরীফ পাঠ করছিলেন। হারুণ দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে উত্তর এলো— 'কে ওখানে?'

হারুনের একজন অনুচর বললো— 'সম্রাট হারুন আল রশীদ।'

ভিতর থেকে জবাব এলো— 'সম্রাটের কাছে আমার তো কোন প্রয়োজন নেই।'

অনুচর বললো— 'সাক্ষাৎপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা রসুলের নির্দেশের বিপরীত।'

ভিতর থেকে উত্তর এলো— 'ঠিক। কিন্তু যে নির্জনতাকে মান্য করেছে তার ধ্যানভঙ্গ করার অধিকার তো কারো নেই।' একথা বলে আয়ায দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। হারুন তার হাত স্পর্শ করলেন।

আয়াজ বললেন— 'এত কোমল হাত আমি আর কখনও স্পর্শ করিনি। এ হাত কি দোজখের আগুনের তাপ সহ্য করতে পারবে?'

একথা শুনে হারুন ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং বললেন— 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।'

আয়ায বললেন— 'হে সম্রাট! আপনার পূর্বপুরুষ আব্বাস রসুলে খোদার চাচা হতেন। তিনি রসুলের কাছে মানুষের উপর প্রভুত্বের অধিকার চাইলেন। রসুল বললেন, আমি আপনাকে এক মুহূর্তের জন্য আপনার সত্তার উপর প্রভূত্বের অধিকার দিচ্ছি। অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার করবার অধিকার দিচ্ছি, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করুন।'

হারুন জানতে চাইলেন আয়াযের কোন ঋণ আছে কিনা?

আয়ায বললেন— 'হ্যাঁ আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিনীত হওয়া। মানুষের কাছে আমার কোন ঋণ নেই। আমি আপনার কাছে কিছু চাই না।'

এত অপূর্ব নিরাসক্তির নিদর্শন আর কোথাও আছে কি?

মানুষ বিনত হয়েই আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়, যতই সে নিকটে আসতে থাকে ততই সে বিনীত ও কাতর হয়। ঔদ্ধত্যে কেউ আল্লাহর নৈকট্য পায় না, ত্যাগে ও বিনয়েই পায়।

হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে আল্লাহর সন্ধানে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন— 'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে কোথায় পাব?'

আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর এসেছিল— 'আহত ও ভগ্ন হৃদয়ে আমি আছি।'

মূসা (আঃ) বলেছিলেন— 'আমার চেয়ে এ মুহূর্তে আকুল আহত ও ভগ্ন হৃদয় তো আর কেউ নেই।'

উত্তর এসেছিল— 'তাহলে আমি সেখানেই আছি যেখানে তুমি আছ।'

সত্যিকারের জ্ঞানের চিহ্ন হচ্ছে ইচ্ছার অকপটতা এবং আন্তরিকতা এবং যথার্থ আন্তরিক ইচ্ছায় মানুষ সকল সম্পর্ক পরিহার করে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ করে। সিদ্‌ক্ বা আন্তরিকতা হচ্ছে আল্লাহর তরবারির মতো, সকল বাসনা এবং পার্থিবতাকে সে হত্যা করে।

কথিত আছে, যুন্নুন মিসরী নামক একজন সাধক শিষ্য পরিবৃত হয়ে একটি নৌকায় নীল নদীতে ভ্রমণ করছিলেন। অপর দিক থেকে একটি নৌকা আসছিল যার মধ্যে উৎসবরত যুবক-যুবতীরা নৃত্যগীতে আনন্দ করছিল।

www.nagorikpathagar.org

শিষ্যরা যুননুনকে বললো— 'প্রভু, আল্লাহর কাছে বলুন এরা যেন ধ্বংস হয়।'

যুননুন আল্লাহর উদ্দেশে হাত তুলে বললেন— 'হে আল্লাহ, এ পৃথিবীতে এদের যে আনন্দময় জীবন দিয়েছ পরলোকেও এদের জন্য আনন্দময় জীবন যেন হয়।'

উৎসবরত নৌকার লোকেরা যুননুনকে দেখে লজ্জিত হলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

যুন্নুন বললেন—'পরলোকের আনন্দের জন্য বর্তমানে লোকের অনুশোচনার প্রয়োজন।'

উক্ত কাহিনীর সারমর্ম হচ্ছে, কোন মানুষই সর্বসময়ের জন্য অকল্যাণবহ নয়। সুতরাং কোন অন্যায়কারীর ধ্বংস কামনা করা তাকে রক্ষা করা নয়, বরং অনুশোচনার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা। যে মানুষ এ মুহূর্তে নিষ্ঠুর অথবা দুর্বিনীত সেই হয়তো অনুশোচনার সুযোগ পেলে বিনয় এবং বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষকে ন্যায়বান হবার সুযোগ দেয়া। এ কারণেই কোরান শরীফে বলা হচ্ছে— 'তুমি মৃত্তিকার উপর পদদাপে হাঁটবে না, মমতা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে হাঁটবে।'

এর অর্থ হলো, আমরা যেন উদ্ধত না হই, নিষ্ঠুর না হই, আমরা যেন বিনয়ে ও বিশ্বাসে, সদাচরণে জাগ্রত থাকি। এভাবেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য পাব এবং এভাবেই তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ এ কথাই বলেছিলেন যে, কেউ যদি বিনয়ে ও বিশ্বাসে আহত হৃদয়ে অপরাধবোধে সদা শংকিত থাকে তাহলে আল্লাহ তার নিকট আসেন।

আবু হামযা নামক সাধক বলেছিলেন— 'যদি তোমার নফ্স বা আত্মবোধকে বা 'বাসনাকে শাসনে রাখতে পারো অর্থাৎ যদি তোমার নফস্ তোমার কাছ থেকে সুরক্ষিত থাকে, তাহলেই তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করলে এবং যদি মানব সম্প্রদায় তোমার কাছ থেকে রক্ষা পায় অর্থাৎ মানুষকে যদি তুমি অন্যায় পথে পরিচালিত না করো, তাহলে মানুষের প্রতি তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করলে।'

এভাবে দেখতে পাই, প্রত্যেক মানুষের দুটি দায়িত্ব আছে একটি তার নিজের প্রতি আর একটি পৃথিবীর প্রতি। আমরা বিনয়ী ও নিরহংকার হলেই এ দায়িত্বে সফলকাম হতে পারবো।

॥ ১০॥

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আদহাম বিন মানসুর যথার্থ ন্যায় পথের পথিক ছিলেন এবং তাঁর সময়কার অনেক সাধকদের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার কাছে দীক্ষা লাভ করেন। এবং ইলম্ বা ঐশ্বরিক জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি বলখ্ দেশের রাজপুত্র ছিলেন।

কথিত আছে, একদিন তিনি শিকারে গিয়েছেন এবং একটি সুদৃশ্য হরিণের পশ্চাতে ধাবমান হয়েছেন, এমন সময় তাঁর মনে হলো হরিণ তাকে সম্বোধন করে বলছে— 'তোমার জন্ম কি শিকার করার জন্য হয়েছে, না তুমি কারও নির্দেশে শিকার করছো?'

ইবরাহীমের চৈতন্য হলো। তাই তো! তিনি এতদিন বৃথাই মৃগয়া ধ্যানে সময় কাটিয়েছেন। তিনি রাজপুত্রের বেশ পরিত্যাগ করে সংসারত্যাগী সাধক হলেন এবং সাধনকর্মে অনেকের সহায়তা লাভ করলেন। সূফী যুনায়েদ বলেছেন— 'ইবরাহীম হচ্ছেন আধ্যাত্মজ্ঞানের কুঞ্জিকা।'

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম বলতেন— 'আল্লাহকে সর্বদা সর্বত্র তোমার সঙ্গী করো এবং মানবসঙ্গ পরিহার করো। অর্থাৎ যিনি যথার্থই আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর দিকে লক্ষ্য করেন অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করবার তার প্রয়োজন হয় না।'

নিষ্কলুষ প্রেম তখনই জাগে যখন আমরা কামনা এবং রিপুর বন্ধন থেকে মুক্ত হই। যারা রিপুর সঙ্গে সম্পর্কিত তারা আল্লাহ থেকে বিযুক্ত এবং যারা রিপুকে পরাভূত এবং অবদমিত করেছে তারাই আল্লাহর সঙ্গে বসতি করে। সুতরাং মানুষ কখনই একাকী নয়, আল্লাহর সঙ্গে বসতি করে সে মানবকুলে প্রতিনিধি হয়। যখন কেউ নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না কিন্তু রিপুর অনুগমন করে তখন সে মানবকুল থেকে দূরে সরে যায়। সে তখন প্রতিনিধি হতে পারে না। যিনি আল্লাহকে অনুসন্ধান করেন তার স্বভাব বা ইসতিকামাত দুটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল, যার একটি জ্ঞানগত, অন্যটি কর্মগত। জ্ঞানগত স্বভাব হচ্ছে—সমস্ত ন্যায় এবং অন্যায়কে বিধাতা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ভাবা অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত বিশ্ববিধান বলে গণ্য করা, কর্মগত স্বভাব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, ন্যায়ের প্রতি সতত অটল থাকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকা। শুধুমাত্র পূর্ব নির্ধারিত ভেবে কর্ম থেকে বিরত থাকার অধিকার কারও নেই। সুতরাং মানুষকে ভালোবাসার অধিকারও আমার উপর অর্পিত, কেননা এক ভালোবাসার সাহায্যেই দুটি প্রাণের একাত্মতা বা তৌহিদ নির্মিত হয়।

—

www.nagorikpathagar.org

হে প্রভু আমি উপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রাসঙ্গিকী

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই বইটি আমি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে প্রকাশ করেছিলাম। মুদ্রণজনিত দ্রুততার কারণে পুস্তকের মধ্যে পরিচ্ছেদ ভাগ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হয়নি। বর্তমান সংস্করণে সেই ত্রুটিগুলো সংশোধিত হল এবং কিছু অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হল।

এ-গ্রন্থের মধ্যে মিষ্টার খান বলে একজন প্রকৌশলীর কথা আছে। পবিত্র নগরী দু'টিতে অবস্থানকালে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বর্তমানে পরলোক গমন করেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ড. সৈয়দ আলী আশরাফ বর্তমানে কেমব্রীজে স্থায়ী বসবাস করছেন। তারই ব্যবস্থাপনায় মক্কা ও মদিনাতে আমার অবস্থান সুস্থ হয়েছিল।

কল্যাণীয় বুলবুল সরওয়ার এ-গ্রন্থ লেখায় আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। জীবন ক্ষেত্রে আমি তার সমৃদ্ধি কামনা করি।

তৃতীয় সংস্করণ

দীর্ঘদিন বইটি পুনর্মুর্দ্রণের অপেক্ষায় ছিল। স্নেহভাজন মাহবুবুল হকের আগ্রহে বর্তমান মুদ্রণটিও সম্ভবপর হল। এ-মুদ্রণে নতুন কোন সংযোজন নেই। সংশোধনও নেই। পাঠকদের কাছে এ-গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা আছে। অনেকেই বইটির সন্ধান করেছেন কিন্তু বাজারে পাননি। তাঁদের আগ্রহেই বইটি পুনর্মুদ্রিত হল।

৬০/১ উত্তর ধানমন্ডি — সৈয়দ আলী আহসান

ঢাকা ১২০৫ — মে ১৯৯৮

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের নিবেদন

পবিত্র হজ্জ ও উমরাহকে কেন্দ্র করে কাবাগৃহ তাওয়াফ করা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি পরিচিত ও আবেগ তাড়িত বিষয়। প্রতিদিন, প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ পবিত্র নগরী মক্কায় সমবেত হচ্ছে একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, আর তা হচ্ছে খোদার সন্তুষ্টি। পৃথিবীর আর কোন ধর্মেই এমন কেন্দ্রাভিমুখী কোন পরিভ্রমণ আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ-অনুষ্ঠান একই সাথে একক ও অনন্য।

হজ্জ ও পবিত্রভূমি ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহুভাষায় অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এ-সব বইয়ের কোনটিতে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা আবার কোনটিতে পথযাত্রার বিস্তারিত বিবরণই মুখ্য। কেউ কেউ সমন্বিতভাবেও লিখেছেন, কিন্তু সাহিত্য বিবেচনায় তা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয়নি। এ-বইটি এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম। পরিসর সংক্ষিপ্ত রেখেও যে শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্মিত হতে পারে, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আরেকবার তা প্রমাণ করে দেখালেন।

বইটির উত্তরোত্তর পাঠকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকলেই আমরা কৃতার্থ।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের অনেকদিন পর্যন্ত কোনো সন্তান ছিল না, সন্তান জন্ম নেবার কোনো ভরসাও ছিল না। এক রাত্রিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি তাঁর তাঁবুর বাইরে এলেন এবং আকাশের দিকে তাকালেন। সে-সময় দৈববাণী হল : তুমি আকাশের দিকে তাকাও এবং নক্ষত্রগুলো নণনা করবার চেষ্টা করো। দেখ গণনা করা যায় কি না।

ইব্রাহীম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন আবার দৈববাণী হল : আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মতোই তোমার বংশপরম্পরা গড়ে উঠবে।

হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী বিবি সারাহ্ তখন বৃদ্ধা। ইব্রাহীমেরও বয়স অনেক। সারাহ্‌র সন্তান সম্ভাবনা ছিল না। সারাহ্ তাই তাঁর মিশর দেশীয় যুবতী পরিচারিকা হাজেরাকে ইব্রাহীমের হাতে সমর্পণ করলেন। ইব্রাহীম হাজেরাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হাজেরা ও সারাহ্‌র মধ্যে তিক্ততা গড়ে উঠল এবং হাজেরা গোপনে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর বেদনা এবং আর্তনাদ নিবেদন করলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্‌তা হাজেরার কাছে আল্লাহ্‌র বাণী নিবেদন করলেন, তোমার আর্ত আবেদন আল্লাহ্‌তায়ালা শুনেছেন। তিনি বিপুলভাবে তোমার বংশ বৃদ্ধি করবেন। তুমি সন্তানবতী হবে। সে সন্তানের নাম রাখবে ইসমাইল।

হাজেরা ফেরেশতার কাছে এই সংবাদ পেয়ে ইব্রাহীম ও সারাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁদেরকে এ-সংবাদ জানান। হাজেরা এক পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং ইব্রাহীম তাঁর নাম রাখেন ইসমাইল যার অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ্ শ্রবণ করবেন।"

যখন ইসমাইলের বয়স তের, ইব্রাহীমের তখন বয়স একশ এবং সারাহ্‌র নব্বই বৎসর। সে-সময় আল্লাহ্ আবার ইব্রাহীমকে ডেকে বললেন, সারাহারও এক সন্তান হবে এবং তাঁর নাম রাখবে ইসহাক।

ইব্রাহীম ভয় পেলেন যে, সম্ভবত সারাহ্‌র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ইসমাইল আল্লাহ্‌র রহমত লাভে বঞ্চিত হবে। তিনি তাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্ ইসমাইল যেন তোমার কাছে সতত বিদ্যমান থাকে।

আল্লাহ্ তখন ইব্রাহীমকে বললেন, ইসমাইলের জন্য চিন্তা করো না, আমি তাকে অভিনন্দিত করেছি। তার মাধ্যমে এক বিরাট জাতি গড়ে উঠবে। কিন্তু ইসহাকের মাধ্যমে পৃথিবীতে আমি আমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাই। আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়ে সারাহ্ ইসহাককে জন্ম দেবে।

ইসহাকের জন্মের পর সারাহ্ ইসহাককে লালন করতে লাগলেন। শিশু ইসহাক

www.nagorikpathagar.org

যখন একটু বড় হয়েছে তখন সারাহ্ ইব্রাহীমকে বললেন যে, হাজেরা তার সন্তান নিয়ে এ-গৃহে আর থাকতে পারবে না। এ-কথায় ইব্রাহীম খুব দুঃখ পেলেন। কেননা ইসমাইলকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। আল্লাহ্ আবার তাঁকে নির্দেশ দিলেন সারাহ্র কথা মান্য করতে। আবার তিনি বললেন যে, ইসমাইলের প্রতি তাঁর কল্যাণ রয়েছে।

এভাবে ইব্রাহীমের সূত্র থেকে দুটি মহৎ জাতি গড়ে ওঠে। একটি ইসমাইলকে অবলম্বন করে, আর একটি ইসহাককে অবলম্বন করে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মহত্ত্ব এবং বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ-দুটি জাতির গোড়াপত্তন করলেন। এভাবে ইব্রাহীম আল্লাহ্র অশেষ কৃপার প্রস্রবণী হলেন। একটি কৃপা প্রকাশিত হল ইসমাইলকে কেন্দ্র করে, অন্যটি প্রকাশিত হল ইসহাককে কেন্দ্র করে। ইব্রাহীম আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করলেন এবং হাজেরা ও ইসমাইলকে আল্লাহ্র আর্শীর্বাদের কাছে অর্পণ করলেন।

ইব্রাহীম যেখানে ছিলেন সেখানকার ভূমি পবিত্র ছিল। কিন্তু আর একটি পবিত্র ভূমি ছিল যে ভূমির কথা ইব্রাহিম জানতেন না। এই ভূমির পথে হাজেরা ও ইসমাইলকে নিয়ে ইব্রাহীম পরিচালিত হলেন। ভূমিটি ছিল আরব দেশের একটি উষর অঞ্চল। কানান থেকে ৪০ উটের দিবসে অবস্থিত।

তিনি বেকা নামক একটি সংকীর্ণ স্থানে হাজেরাকে পুত্রসহ রেখে এলেন। এই উপত্যকার চতুর্দিকে পাহাড় ছিল এবং উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আসার তিনটি পার্বত্য পথ ছিল যার একটি পথ ছিল উত্তরের দিকে, একটি দক্ষিণের দিকে। কী করে ইব্রাহীম হাজেরা এবং ইসমাইলকে নিয়ে বেকা উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু যেহেতু চিরদিন আরবের উটের কাফেলা এই পথ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে যেত, সে-কারণেই সম্ভবত এই পথ ধরেই হাজেরা ও ইসমাইলকে ইব্রাহীম বেকা উপত্যকায় রেখে এসেছিলেন। সেখানে তাদেরকে নিঃসঙ্গ রেখে ইব্রাহীম সারাহ্র কাছে ফিরে যান।

এখানে অবস্থানকালে এক পর্যায়ে ইসমাইল তৃষ্ণায় মরণাপন্ন হন। হাজেরা তখন পানির সন্ধানে দুটি অনুচ্চ পর্বত শিখরে বারবার উঠে পানির অনুসন্ধান করছিলেন। সম্ভবত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে কোনো কাফেলা লক্ষ্যগোচর হয় কি না তাও তিনি দেখছিলেন। এভাবে সাতবার তিনি একটি পর্বত শিখর থেকে আর একটি পর্বত শিখরে দৌড়ে যান। এ দুটি পাহাড় চূড়ার নাম হচ্ছে সাফা এবং মারওয়া। সপ্তমবার দৌড়ে আসার পর হাজেরা যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন তিনি আল্লাহ্র বাণী শুনতে পেলেন : হাজেরা তুমি ভয় পেও না। তোমার সন্তান যেখানে আছে সেখানে তুমি দৌড়ে যাও। আমি তোমার সন্তানের মাধ্যমে বিরাট একটি জাতি সৃষ্টি করব।

হাজেরা দৌড়ে দিয়ে দেখেন যে, ইসমাইলের পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এ নহরই জমজমের উৎস। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কাফেলা এ- পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এ প্রস্রবণের তীরে হাজেরা ও ইসমাইলকে দেখতে পান। এভাবে ক্রমশ প্রস্রবণটিকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট জনপদ গড়ে ওঠে এবং সকল প্রকার কাফেলার বিশ্রাম এবং অবস্থানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

www.nagorikpathagar.org

এর পরে বাইবেলে ইসহাকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসমাইলের কোনো কাহিনী বর্ণিত হয়নি। ইসমাইল সম্পর্কে বাইবেলের জেনেসিস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "—এবং আল্লাহ্ বালকের সঙ্গে ছিলেন এবং তরুণ বালকটি ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং জনপদহীন অঞ্চলে শক্তিমান ধনুর্ধর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" এরপর বাইবেলে ইসমাইলের নাম একবার মাত্র এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতা ইসমাইল এবং ইসহাক তাঁদের পিতাকে হেবরন অঞ্চলে সমাহিত করে।

পবিত্র কোরান শরীফে হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাইলের কাহিনী বর্ণিত আছে। যখন জমজম কূপ প্রকাশ পেল এবং সেই কূপকে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে উঠল তখন ইব্রাহীম সেখানে আবার এলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ পেলেন যে, জমজম কূপের নিকটে আল্লাহ্‌র একটি গৃহ নির্মাণ করতে হবে। পিতা এবং পুত্র উভয়ে মিলিতভাবে এই গৃহ নির্মাণ করলেন। কী করে এই গৃহ নির্মাণ করতে হবে তার নির্দেশ তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পেয়েছিলেন। এই গৃহের নাম রাখা হয় 'কাবা'।

পবিত্র কাবা ঘরটি চতুষ্কৌণিক। কাবা গৃহের এক কোণে একটি পবিত্র পাথর স্থাপিত আছে। এই প্রস্তরখণ্ডটি আবু কুবায়েস পর্বতের ওপর থেকে হযরত ইব্রাহীমকে একজন ফেরেস্তা এনে দেন। প্রস্তরখণ্ডটি পৃথিবীর নয়। এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশে আকাশ থেকে আবু কুবায়েশ পর্বতের উপর পতিত হয়েছিল। কোরান শরীফে বলা হয়েছে যে, দুগ্ধশুভ্র এই প্রস্তরখণ্ডটি আকাশ থেকে ভূতলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু পাপভারে পীড়িত মানুষের চুম্বনে প্রস্তরখণ্ডটি ক্রমশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কাবা গৃহের নির্মাণ কাজ যখন সমাপ্ত হয় তখন এর পূর্বকোণে এই প্রস্তরখণ্ডটি স্থাপন করা হয়। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহীমকে নির্দেশ দেন, আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র কর যারা এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে, যারা এর সামনে মস্তক নত করবে এবং যারা সিজদা দিবে। সকল মানুষের কাছে হজ্জব্রত পালনের ঘোষণা দাও, যেন তারা পায়ে হেঁটে এখানে আসে অথবা উটের পৃষ্ঠে পর্বত ও উপত্যকা অতিক্রম করে।

হাজেরা ইব্রাহীমকে বলেছিলেন কী করে সাহায্যের সন্ধানে তিনি সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এবং পুনরায় মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সাতবার দৌড়ে গিয়েছিলেন। এই স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হযরত ইব্রাহীম নির্দেশ দেন যে, যারা হজ্জব্রত পালন করবে তারা কাবাগৃহ প্রদক্ষিণের পর সাতবার সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা সাতবার দৌড়ে যাবে। এই পথযাত্রাকে 'সাঈ' বলে।

ইব্রাহীম ছিলেন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্য সাধক। সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ধর্মের কার্যক্রমের গণনা আমরা ইব্রাহীম থেকেই করে থাকি। ইব্রাহীমের পিতা আজর ছিলেন মূর্তিপূজক এবং তাঁর ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। আজর নিয়মিত মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং দক্ষ মূর্তিনির্মাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। শৈশব থেকেই ইব্রাহীম মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপ ছিলেন। শৈশবেই তাঁর মনের মধ্যে চিন্তা জাগে যে, মানুষের হাতের তৈরি মাটির পুতুল কী করে মানুষকে কল্যাণ প্রদানের অধিকারী হয়। এই জিজ্ঞাসায় ক্রমশ ইব্রাহীম তাঁর পিতৃপুরুষদের পূজার্চনা বিধির প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েন। একবার

www.nagorikpathagar.org

উৎসবের দিনে ইব্রাহীমের পিতা আজর পুত্রকে মূর্তিঘরের প্রহরায় রেখে নিজে উৎসবে যোগদান করেন। পিতার অনুপস্থিতিতে ইব্রাহীম কুঠার দিয়ে মূর্তিগুলোকে ভাঙচুর করেন এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকৃতির মূর্তির ঘাড়ে কুঠারটি ঝুলিয়ে রেখে পিতার অপেক্ষা করতে থাকেন।

পিতা এসে তাঁর মূর্তিগুলোর এই ধ্বংস দেখে হাহাকার করে ওঠেন এবং ইব্রাহীমকে ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ইব্রাহীম পিতাকে সংক্ষেপে বলেন, যে মূর্তির কুঠারটি রয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করুন।

আজর উত্তরে বলেন, মূর্তির কি প্রাণ আছে যে সে কথা বলতে পারবে?

ইব্রাহীম তখন পিতাকে প্রশ্ন করেন, যার প্রাণ নেই, সে কী করে মানুষকে সৌভাগ্য দান করতে পারে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ প্রদান করতে পারে? এরপর ইব্রাহীম তাঁর পিতাকে অনুনয় করলেন তাঁর পিতা যেন মূর্তিপূজা ছেড়ে দেন। কিন্তু আজর তার পিতৃপুরুষের প্রথা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না।

ইব্রাহীম বহুবিধ জিজ্ঞাসা এবং পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। যখন রাত্রিবেলা আকাশে চাঁদ দেখা গিয়েছিল এবং চাঁদের আলোতে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়েছিল, তখন তিনি মনে করেছিলেন, এই চাঁদই বিশ্বপ্রভু। কিন্তু চাঁদ যখন অস্তমিত হল তখন তিনি ভাবলেন, যে বস্তু অন্তরালে যায়, দৃষ্টির আড়ালে যায়, সে কী করে বিশ্বপ্রভু হতে পারে?

দিবসে বিরাট দীপ্যমান সূর্য যখন তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল তখন তিনি ভাবলেন, সূর্যই বিশ্বনিয়ন্তা। কেননা এত বিরাট আর এত উজ্জ্বল আর তো কিছু হতে পারে না। কিন্তু সূর্য যখন সন্ধ্যাকালে অস্তমিত হল তখন তিনি ভাবলেন যে, সূর্য বিশ্বনিয়ন্তা হতে পারে না। বিশ্বনিয়ন্তা হচ্ছেন তিনি যিনি চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ করেছেন। বিশ্বনিয়ন্তা তিনি, যাঁর নির্দেশে দিবারাত্রি পরিক্রমা চলে, সূর্য-চন্দ্রের আবর্তন ঘটে। এভাবে ইব্রাহীম সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজের চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের উৎস।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহীমের সত্য আবিষ্কারের ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

স্মরণ করো, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল : আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

এভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল : 'এটিই আমার প্রতিপালক।'

অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।'

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল :

'এটি আমার প্রতিপালক।'

যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল: 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল : 'এটি আমার মহান প্রতিপালক।'

যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন সে বলল : 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল : 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবু কি তোমরা অনুধাবন করবে না? তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? যে-বিষয়ে তিনি তোমাদের কোনো সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লাহ্‌র অংশী করতে ভয় কর না। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বলো দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে (অংশীস্থাপন দ্বারা) কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।' এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী। এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এব তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।

কুরআন শরীফে ইব্রাহীমের বিবরণ আরো আছে। পিতা আজরকে প্রতিমা পূজা থেকে নিবৃত হওয়ার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তার বিবরণ নিম্নরূপে দেওয়া আছে :

সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : 'তোমরা কীসের উপাসনা কর?'

ওরা বলল : 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজায় নিরত থাকব।' সে বলল, 'তোমরা আহ্বান করলে ওরা কি শোনে অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?'

ওরা বলল : 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি।'

তোমরা কি যার পূজা করছ তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরষেরা যার পূজা করত? বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত আর সকলেই আমার শত্রু; তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন। এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখের উদ্যানের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট। এবং আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করো না।

যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আসবে। জান্নাত সাবধানীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। ওদের বলা হবে : 'তারা কোথায়, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের তোমরা উপাসনা করতে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসেব? না ওরা আত্মরক্ষা করবে সক্ষম?' অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও।

ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম।' এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু ওদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

হযরত ইব্রাহীম বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা থেকে আমরা ইসলামের ধারাক্রম গণনা করি। ইব্রাহীম যখন তাঁর সত্য প্রচার কাজে নিযুক্ত তখন অভিশপ্ত নৃপতি নমরুদ তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। যখন ইব্রাহীম মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন এবং নমরুদের লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

"তোমরা নিজেরা সেগুলোকে খোদাই করে নির্মাণ করছ সেগুলোকেই কি তোমরা পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা সৃষ্টি করছ তাও আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি।"

তখন তারা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাতে ইব্রাহীমকে নিক্ষেপ করেছিল। অগ্নিকুণ্ড তাঁকে দহন করল না। ইব্রাহীম নির্বিঘ্নে অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

নমরুদের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার আগে ইব্রাহীম একটি কথোপকথনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্রাহীম নমরুদকে বলেছিলেন ঃ "তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।"

www.nagorikpathagar.org

নমরুদ উত্তরে বলেছিল, "আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।"

ইব্রাহীম তখন বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান। তুমি যদি পার তাকে পশ্চিমে দিক থেকে উদয় করাও।"

ইব্রাহীমের উত্তর শুনে নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু সৎপথে পরিচালিত হল না।

এরপর হাজেরার গর্ভে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশেই আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মোহাম্মদ (স) মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির শাশ্বত বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

www.nagorikpathagar.org

আমার জীবনে কখনো কাবা গৃহ দর্শন, তাওয়াফ এবং সাঈ করা সম্ভবপর হবে বলে আমি ধারণা করিনি। শুধু এর বিবরণ শুনেছি বিভিন্ন লোকের মুখে, চিত্রদর্শন করেছি এবং সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনে হজ্জের দৃশ্যমান উপকরণ এবং ঘটনাগুলো দেখেছি। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের মতো পবিত্র কাবা আমার কাছে একটি পরিচিত জায়গা। আমি আমার মনের মুকুরে কাবার একটি চিত্র প্রতিফলিত করে রেখেছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ কাবাগৃহের সম্মুখে এসে মনে হল ছবিতে যা দেখেছি এবং মানুষের মুখে যা শুনেছি তার কোনোটাই সাক্ষাৎ দর্শনের মতো নয়।

সাক্ষাৎ দর্শনটি একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা! তখন মনে হল আমি অনন্তকে স্পর্শ করছি, একটি সর্বকালীন প্রত্যাশাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করছি, একটি বিশিষ্ট জাগরণের মধ্যে জাগরিত হচ্ছি, একটি বিশ্বাসের নিগূঢ়তায় নতুন একটি চৈতন্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপিত দেখছি। এই অভিজ্ঞতার তুলনা নেই, এই অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মনে হয় আমি আমার সর্বকালের আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। একটি অপরিসীম স্নিগ্ধতায়, একটি অনিবার্য মোহনীয়তায় আমি আচ্ছন্ন হচ্ছি। কাবা গৃহের চতুর্দিকে সময়ের কোনো বন্ধন নেই। প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে এবং এভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের বিরামহীন পরিক্রমা চলছে— যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই।

বিভিন্ন মুহূর্তে দেখেছি, কাবা গৃহের চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে চলেছে। কত দেশের মানুষ, কত ভাষার মানুষ, কত বিবিধ আচরণের মানুষ— একটি মাত্র বিশ্বাসের সচলতায় কাবাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সকলেই বলছে : "হে আমার প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে সকল গ্লানি থেকে মুক্ত করো, আমাকে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার এবং সকল কর্মের পাপ থেকে মুক্ত করো, আমাকে পরিচ্ছন্ন এবং জ্যোতির্ময় করো।"

ক্রন্দনে আকুল অযুত-নিযুত কণ্ঠ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই একই কথা বলে চলেছে। আমি ভেবেছিলাম, কখনো হয়তো আমি মক্কা শরিফে যেতে পারব না। শারীরিক অসুস্থতা আমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যখন মিশরে যাবার আমন্ত্রণ পেলাম তখন ভাবলাম, মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যদি ওমরাহ হজ্জ করতে আসতে পারি তবেই আমি মিশরে যাবো। ৬ই মার্চ আমি করাচি থেকে মিশরীয় বিমানে কায়রো পৌছলাম। তার আগে ঢাকা থেকে পি. আই.-এর বিমানে তিন তারিখে করাচিতে যেতে হয়েছিল এবং করাচিতে তিন দিন ছিলাম। করাচি আমার পুরনো জায়গা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এখন সে করাচি আর নেই। অজস্র অট্টালিকাশ্রেণী করাচি শহরকে একটি কর্মমুখর জনপদে পরিণত করেছে। বিভিন্ন ধরনের বাসপোযোগী গৃহ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমন্বিত হয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। লাহোর অথবা দিল্লীর যেমন একটি নিজস্ব সত্তা আছে, করাচির সে-রকম নেই। করাচি বহু পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

করাচির ইমারতগুলো তাই কোনো বিশেষ আঞ্চলিক উচ্চারণকে প্রকাশ করে না। আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, হাইওয়ে, বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা, পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র-এর সমস্ত কিছু যে-কোনো আন্তর্জাতিক শহরের সমতুল্য। আমি করাচি অবস্থানকালে আমার পরিচিত পুরনো করাচিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফলকাম হইনি। আমার সময়কার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এখন নেই। যে দু-একজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে একটি সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল ইন্টারকন্টিনেটাল হোটেলে। সেখানে কয়েকজন পুরনো বন্ধু এসেছিলেন যেমন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জামিল জালিবি, কায়েদে আযম ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল শরীফ আল মুজাহিদ এবং উর্দু ডেভেলপ মেন্ট বোর্ডের এক সময়কার প্রধান শানুল হক হক্কী। বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি, দেখা করতে পারিনি। বেগম জেবুন্নেসা এস. ওয়াজেদ আলীর কন্যা। বর্তমানে বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে। একসময় 'মিরর' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। টেলিফোনে জানতে চাইলেন আমরা বাংলাদেশে তাঁর পিতার গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি কি না। তিনি তাঁর নিজের জীবনের কথা বললেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একটি অসহায় নির্জনতায় তিনি সময় কাটাচ্ছেন।

১৯৬২ সালে বেগম জেবুন্নেসাকে আমি প্যারিসে সাঁজালিজের পথে দেখি। আমি রাত্রিবেলা সাঁজালিজের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিলাম এবং রাস্তার পাশে আলোকিত বিপণি শোভা দেখছিলাম। সে-সময় হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে স্বামীসহ বেগম জেবুন্নেসাকে দেখি। তারপর আমরা একটি চায়ের দোকানে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং রুচিবান মহিলা। হাতের কব্জিবন্ধ পর্যন্ত আবৃত ফুলহাতা ব্লাউজ পরতেন। শাড়ি তাঁর শরীরের একটি সৌজন্যের আবরণ দিত। অথচ তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং এক ইংরেজ রমণীর কন্যা। নাজিমাবাদে আমার বাসায় অনেকবার এসেছেন। তাঁর মুখে শুনলাম, শিল্পী সাদেকাইন মারা গিয়েছেন। তিনি বললেন, যারা সুন্দর তারাই চলে যায়। যাদের কিছু দেবার থাকে তারাই তাদের সবটা দিতে পারে না। এদিকে পৃথিবী ঘাতকদের অধিকারে থাকে। তিনি মানসিকভাবে আহত এবং ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাই তাঁর কথার প্রতিবাদ করলাম না।

করাচিতে যাদের বাসায় ছিলাম তারা অত্যন্ত ভদ্র এবং সজ্জন। গৃহের পরিচালনা এবং আচরণ বিধি অত্যন্ত শৃংখলার। একান্নবর্তী পরিবার। গৃহকর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন ধর্মপ্রাণ বলিষ্ঠ পুরুষ। বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে। স্বল্পবাক এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের এই ব্যক্তি অধিকাংশ সময় মসজিদেরই কাটান, আবার তিনিই গৃহের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর বড় ছেলে একটি কারখানার ম্যানিজিং ডাইরেক্টর। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রতা পাকিস্তান বিমানের প্রধান প্রকৌশলী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র পাকিস্তানের জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন।

বাড়ির অভ্যন্তরের মহিলারা অত্যন্ত শান্ত ও নির্জনতায় বাস করেন। এই গৃহে যে কদিন ছিলাম সে কদিন আমাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটিই হয়নি। বরঞ্চ এত নিখুঁত ছিল যে, আমার কাছে শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয়েছিল। এক প্রকার যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায় বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হত। সারা দুপুর এমনকি সন্ধ্যার পরও বাড়িটি অদ্ভুত শান্ত মনে হত। কোথাও কোন সাড়া শব্দ ছিল না। শুধু যেদিন আমরা খুব সকালে গৃহত্যাগ করে কায়রো যাবো বলে বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কিছুক্ষণ আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে অসম্ভব সৌজন্য ছিল। বিনয় ছিল। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল কিছুটা অসহায়তা ও দুঃখও ছিল। এই গৃহের অপূর্ব শৃংখলা এবং নিস্তব্ধতা ভদ্রমহিলাকে কেমন যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে বলে আমার মনে হল।

এই গৃহের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। কেননা আপ্যায়নের দিক থেকে একটি পরিপূর্ণতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু যে জিনিসটা পাইনি, তা হচ্ছে এক প্রকার অকুণ্ঠ সহজতা। আমি এটাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমাদের কোনো আত্মীয় ছিল না। দু'টি ছোট বেড়াল ছিল। বেড়াল দু'টি ঘরের বাইরে আঙিনায় ঘোরাফেরা করত। আমি কোনো কোনো সময় আঙিনায় নেমে বেড়াল দু'টির সঙ্গে খেলা করবার চেষ্টা করতাম।

আর একটি ঘটনার কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করছি। কায়রো থেকে আমাদের টিকেট আসার কথা ছিল ইজিপ্ট এয়ার লাইয়েন্সের অফিসে। কিন্তু ইজিপ্ট এয়ার লাইন্স সে মর্মে কায়রো থেকে কোনো নির্দেশ পায়নি। সুতরাং তারা আমাদের আমন্ত্রণপত্র দেখেও টিকেট দেয়নি। কায়রোতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারও কোনো উত্তর ৫ তারিখের মধ্যে পাইনি। সে-সময় আমার পূর্ব পরিচিত সুজাউদ্দৌলা নামে এক ভদ্রলোক আমাদের অসুবিধার কথা শুনে আমার এবং আমার ভাই আলী নকীর কায়রো এবং কায়রো থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'টি টিকেট কিনে দেন।

৫ তারিখে সারাদিন ছুটোছুটি করে ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে ডলার ক্রয় করে তিনি যখন টিকেট আমাদের হাতে দিলেন তখন রাত ৮টা। স্থির হয় যে, কায়রোতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে টিকেটের টাকা পেয়ে সুজাউদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করব। পরের দিন খুব সকালে সুজাউদ্দৌলা নিজে এসে আমাদের করাচি বিমান বন্দরে পৌঁছে দেন। সুজাউদ্দৌলার সৌজন্য, কর্তব্যবোধ, মমতা এবং আন্তরিকতা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

করাচির বাড়িঘরগুলো আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। আবহাওয়া অনুসারে বাড়িঘরগুলো খোলামেলা। বারান্দা আছে, উন্মুক্ত জানালা আছে, কোথাও কোথা

www.nagorikpathagar.org

খোলা সিঁড়ি আছে। নতুন বাড়িগুলোর কোনোটাই আবদ্ধ নয়। বাইরের রাস্তা অথবা বাড়ির আঙিনার সঙ্গে বাড়ির অভ্যন্তর ভাগের একটি সংযোগ আছে। করাচি কোনো ঐতিহাসিক শহর নয়। সুতরাং প্রাচীন কোনো ভবন এই শহরকে অলংকৃত করেনি। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার বাড়িঘরগুলো তৈরি হয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে মোহনীয় শিল্প নিদর্শন এ-শহরে না থাকলেও ব্যবহার উপযোগী অট্টালিকা অনেক নির্মিত হয়েছে।

কায়রোতে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। প্রাচীন অট্টালিকা, মসজিদ, প্রাসাদ, দুর্গের ভগ্নাংশ-এর সবকিছু কায়রো শহরকে প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ভবনগুলোকে অস্বীকার না করে বরঞ্চ সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন ব্যবহার উপযোগী ভবন নির্মিত হয়েছে। সাধারণ বাসগৃহ প্রাচীন গ্রীক বা রোমক শিল্পের (অংশত) অনুকরণে স্তম্ভশোভিত হয়ে পরিদৃশ্যমান হয়েছে।

১৯৫৬ সালে আমি প্রথম কায়রো এসেছিলাম এবং শেষবার কায়রো গিয়েছিলাম ১৯৬০ সালে। কিন্তু এবার দেখলাম সে পুরনো কায়রো আর নেই। কায়রো শহর চতুর্দিকে অনেক ছড়িয়েছে। বিমান বন্দরের কাছাকাছি পর্যন্ত একদিকে অন্যদিকে গীর্জার কাছাকাছি পর্যন্ত শহরের বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কোথাও মুছে যায়নি। গীর্জার কাছাকাছি বাড়িগুলো অনেকটা পিরামিডের আদলে নির্মিত। আবার অন্যদিকে বিমান বন্দরের পথে রাস্তার বিভিন্ন দিকে রামেসিসের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রাচীন দেবতা আমন-রার মূর্তি একটি পুরোনো ইতিহাসের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রাচীনকালে মিশরে একটি শিল্পগত আনন্দের প্রকাশ ছিল। মিশরীয়রা যা কিছু স্পর্শ করেছিল তাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল। তারা গ্রীকদের মতো সুচারু সমতায় কোনো কিছু করেনি। তারা বিপুল এবং বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় সবকিছুকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। সেই প্রাচীনকালে তাদের মূর্তিগুলো দেখে একটি রাজকীয় বিশালতা এবং মহিমান্বিত রূপ মানুষের মনে জেগে ওঠে। শিল্প সমালোচকরা একে বলেছেন, রিগাল মনুমেন্টালিটি। বর্তমান মিশরীয় সরকারও মিশরের এই প্রাচীন চরিত্রকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন।

প্রাচীনকালের মিশরের রাজারা ছিলেন দেবতার পর্যায়ভুক্ত। শুধু রাজারাই নন, রাজপরিবারের সকলেই। তারা যখন রাজাদের মূর্তি নির্মাণ করেছে তখন তার মধ্যে একটি অলৌকিকতা দান করবার এবং অবিনশ্বরতা দান করবার চেষ্টা করেছে। প্রতিটি মূর্তি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে কনফিডেন্ট। তাদের দৃষ্টি দর্শকদের দৃষ্টির উর্ধ্বে অনেক দূরের দিকে প্রসারিত এবং তাদের শরীর সুস্থ এবং বলিষ্ঠ। মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় যে, এদের মধ্যে মনুষ্য জীবনের ভয়, আশা ও নির্যাতনের কোনো উপলব্ধি নেই, বরং একটি অনন্ত জীবনের আশ্বাসের স্বাক্ষর আছে।

প্রথমবার যখন মিশরে এসেছিলাম তখন এবং তারপরে দ্বিতীয়বার আমি মিশরের প্রাচীন জাদুঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। এই জাদুঘরে প্রাচীনকালের ঐশ্বর্যের পর্যাপ্ত নিদর্শন রয়েছে। আমি পূর্বে জাদুঘরে মমি দেখতে পেয়েছিলাম। বর্তমানে মমি কাউকে

www.nagorikpathagar.org

দেখানো হয় না। আনোয়ার সাদত মমিকে লোকদৃষ্টির আড়ালে রেখে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই সমস্ত মমি যাদের, তারা এককালে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন। তাদেরকে অবারিতভাবে জনসমক্ষে উপস্থি করা উচিত নয়।

গীজার তিনটি পিরামিড এবং একটি স্ফীংস যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষকে হতচেতন এবং বিহ্বল করে রেখেছে। এক একটি নিঃসঙ্গ পর্বতের মতো এই বিপুল আয়তনের পিরামিডগুলো কী করে নির্মিত হয়েছিল এবং কারা নির্মাণ করেছিল একথা সুস্পষ্ট নয়। সে-যুগের মানুষ জীবনের চিরকালীনতায় বিশ্বাস করত বলেই মৃত্যুকে তারা নতুন একটি জীবনের দ্বার উন্মোচন হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তাই তারা সমাধি মন্দিররূপে বিপুল আয়তনে পিরামিডগুলো নির্মাণ করেছিল, যেখানে এককালের অধীশ্বর মৃত্যুর পরও যেন জীবনের ঐশ্চর্য ভোগ করতে পারে, এমন ব্যবস্থা তারা করেছিলেন। জীবিতকালে এরা যে জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাদের আত্মা সে জীবনের সৌভাগ্য এবং সম্পদকে আশ্রয় করে যেন চিরকালীন স্বস্তিতে বাস করতে পারে, সমাধি মন্দিরের মধ্যে সেই ব্যবস্থা রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মিশর যেমন একটি প্রাচীন সভ্যতার রহস্য নিকেতন, তেমনি ইসলামী সভ্যতারও একটি আশ্চর্য সমৃদ্ধমান ক্ষেত্র। আরব ভূমি থেকে ইমাম হোসাইনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর ইমাম পরিবারের সকলে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এখনো কায়ারোতে ইমাম হোসাইনের মস্তকের সমাধি, তাঁর পত্নী জয়নাবের সমাধি, তাঁর দৌহিত্রী সৈয়দা নফিসার সমাধিসৌধ আছে। প্রতিটি সমাধিসৌধের সঙ্গে একটি করে সুরম্য মসজিদ আছে। এর সব কটি মসজিদে আমি নামাজ আদায় করেছি এবং মাজার জিয়ারত করেছি। এ-সমস্ত মসজিদ এবং সামাধিসৌধ তুর্কী স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। তুর্কী স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ নিদর্শন হচ্ছে কায়ারোর মোহাম্মদ আলী মসজিদ। বিপুল আয়তনের এবং দুর্নিরীক্ষ উচ্চতায় এই মসজিদটি ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোর কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

এখানে একটা ঘটনা বলি। আমি একদিন ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরছিলাম। গাড়িতে বসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কায়রোর মসজিদগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। সে মোহাম্মদ আলী মসজিদের নামই উল্লেখ করল না। আমি যখন তাকে এই মসজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম তখন সে বলল, "ওটা তো তুর্কী মসজিদ, ওটা আমাদের নয়।" স্থানীয় রাজনীতিতে আরব জাতীয়তাবাদ এমন প্রবলভাবে প্রবেশ করেছে যে, মিশরের তুর্কী আধিপত্যের কাহিনীগুলো অনেকে স্মরণ করতে চায় না।

কায়রোতে সিংহাসনচ্যুত রাজা ফারুকের একটি জাদুঘর আছে। ফারুকের একটি শখ ছিল প্রজাপতি সংরক্ষণ করা। নানা ধরনের প্রজাপতি শো-কেসের মধ্যে সাজিয়ে রাখা। বিভিন্ন রঙের এবং রেখাঙ্কিত বিবিধ প্রকার এই প্রজাপতি মানুষের দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। তাছাড়া নানা ধরনের হরিণ তিনি শিকার করেছেন, সেই সমস্ত হরিণের পা এবং মাথা সাজানো আছে। হাতির কান দিয় একটি টেবিলের উপরিতল নির্মাণ করা হয়েছে। রাজার ব্যবহৃত কিছু মণিমুক্তাও এই জাদুঘরে রক্ষিত আছে। নানাবিধ ব্যসন এবং দ্যুতক্রীড়ায় সময় কাটলেও শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি ফারুকের কিছুটা অনুরাগ ছিল মনে হয়।

www.nagorikpathagar.org

কনফারেন্সের শেষে আমরা সুয়েজ খালের পোর্ট সৈয়দের কাছে ইসমাইলিয়া শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গাড়িতে করে কায়রো থেকে ইসমাইলিয়া যেতে দু'ঘণ্টা লাগে। রাস্তার দু'পাশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে দেখলাম, বিশেষ করে ইসমাইলিয়া শহর একেবারেই নতুন। বাড়িঘর নতুন ধরনের। কায়রোর সঙ্গে একেবারেই মেলে না। আধুনিক বাসোপযোগী গৃহ স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গড়ে উঠেছে।

কায়রো হচ্ছে আরবি সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কোরান শরীফের পঠনের নানাবিধ রীতি মিশরীয়রাই প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী বাসেতের কণ্ঠে কোরান শরিফের আবৃত্তি শুনেছি। অনবদ্য তাঁর কণ্ঠস্বরের কোনো তুলনা নেই। আরব দেশেসমূহের মধ্যে মিশরই একমাত্র দেশ যেখানে কোরান শরিফের ভাষা সম্মানিত মর্যাদায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য জীবনের মধ্যে উচ্চারিত হয়।

ধ্রুপদী আরবি ভাষার চর্চা প্রধানত মিশরেই আছে। টেলিভিশনে আরবি ভাষণগুলো শুনতে অপূর্ব লাগে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে একটি ভাষার যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে মিশরে সেই পরিবর্তন আরবি ভাষাকে স্পর্শ করেনি। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনলাম যে, এর একমাত্র কারণ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। ভাষার ক্ষেত্রে আল আজহারের একটি মৌন শাসন রয়েছে যা সকলেই মান্য করে। এই শাসনের আওতায় থেকে আরবি ভাষার ধ্রুপদী রূপকে সেখানকার অধিবাসীরা সম্মানের সঙ্গে প্রচলিত রেখেছে।

মিশরে আরবরা এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের প্রথম শতাব্দীতেই। কায়রোতে যে ট্যাক্সিচালক মোহাম্মদ আলী মসজিদ সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেনি সেই আমাকে আমর ইবনুল-আস-এর মসজিদের কথা বলেছিল। হযরত ওমরের খেলাফতের সময়ে আমর ইবনুল আস-এর নেতৃত্বে আরব সেনারা মিশরে প্রবশে করে ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। কয়েক বছরের মধ্যে মিশর আরবদের অধিকারে আসে এবং তখন থেকেই ক্রমশ মিশরীয়রা আরব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আরবরা মিশরে বসতি স্থাপন করলে জাতিগত মিশ্রণ ঘটতে থাকে স্থানীয়দের সঙ্গে এবং বর্তমান মিশরীয়রা পুরোপুরিই আরব। শুধু তাই নয়, কোরান শরিফের ভাষাগত এবং উচ্চারণগত শুদ্ধি সংরক্ষণ একমাত্র মিশরেই সম্ভবপর হয়েছে।

আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে আরবি বা ইসলামী জ্ঞানের যথাযথ সিদ্ধির জন্য বাংলাদেশের মানুষ মিশরে গিয়েছে। আমার দাদা উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরে গিয়েছিলেন। ধর্মবিষয়ক জটিল কোন সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আল-আজহারের কাছে যেতাম। আল-আজহারের প্রতিপত্তি যুগে যুগে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, শুধু আমাদেরই সঙ্গে আল আজহারের সংযোগ নষ্ট হয়েছে।

মিশরে সেই যে মুসলিম শাসন শুরু হয়েছিল অদ্যাবধি সেই দেশে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতিপত্তি অব্যাহত রয়েছে। উমাইয়া খেলাফতের পর আব্বাসীয়

www.nagorikpathagar.org

খেলাফত এল। অবশেষে দশম শতকে ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। ফাতেমীয়রা ছিল শিয়া। এরাই মিশরকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তায় পরিণত করে। এ-সময় আল-আজহার মসজিদ নির্মিত হয় এবং মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আল-আজহার ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে, সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বর্তমান আল-আজহার পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষায়তন এবং আল-আজহারের মসজিদটি একটি দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্প।

আল-আজহারের কাছেই কায়রোর বিখ্যাত বাজার খান-খলিলী। এ-ধরনের বাজার আমি ইস্তাম্বুলে দেখেছি, তেহরানে দেখেছি, পেশোয়ারে দেখেছি, লাহোরে এবং দিল্লিতে দেখেছি। সকল প্রকার দ্রব্যের বিপণীসজ্জা নিয়ে অজস্র মানুষের কলগুঞ্জনের মধ্যে এ বাজারটি মধ্যযুগের জীবন যাপনকে উদ্ভাসিত করে। একের পর এক সরু গলিগুলো বিভিন্ন বিপণী প্রসাধনের সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে রহস্যময় আবর্ত নির্মাণ করেছে। এ ধরনের বাজার কখনো পুরনো হয় না। একই রকম স্বভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের ইচ্ছাকে এবং আগ্রহকে ধারণ করে রাখে। আমি শুধু এই বাজারের বৈশিষ্ট্য দেখবার জন্য কিছুটা সময় এর মধ্যে কাটিয়েছিলাম।

প্রথমবার যখন কায়রোতে এসেছিলাম তখন পিরামিড যুগের কিছু পুরনো নিদর্শন, বিশেষ করে আংটির পাথর এসব বাজারে পাওয়া যেত। এখনো দু-একটি দোকানে পাওয়া যায়, দাম খুব বেশি। পিরামিডের মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং একেকটি বস্তুর একাধিক সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। তাই ঐগুলো যাদুঘরে রেখেও কিছু কিছু জিনিস বাইরে বিক্রির জন্য পাওয়া যেত।

কায়রোতে ইমাম হোসাইনের মস্তকের সমাধি আছে, বলেছি। ঐতিহাসিক হিত্তি সাহেব এটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, দামেস্কে ইমাম হোসাইনের মস্তক হোসাইন পরিবারের হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। তারা সেই মস্তক কারবালায় তাঁর দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করে। কারবালার সমধিস্থ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। মিশরীয় পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেছেন যে তাঁরা এ-নিয়ে তর্ক করেন না। যেহেতু জনসাধারণের বিশ্বাসে ইমাম হোসাইনের নামে কবরটি বিখ্যাত হয়ে আছে, সুতরাং তাঁরাও এটাকে মেনে নিয়েছেন। ইরানিরা এখানকার কবরকে মান্য করে না, কিন্তু ভারতীয় শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা এখানে জিয়ারত করতে আসে।

কায়রোর ইসলামী জাদুঘরে ইসলামী যুগের ইসলামী শিল্পকলার প্রভূত উপকরণ রয়েছে। জাদুঘরটি কিন্তু জাতীয় জাদুঘর নয়। খ্রিস্টপূর্ব আমলে পিরামিডের যুগের প্রাচীন জাদুঘরটি জাতীয় জাদুঘররূপে স্বীকৃত। ইসলামী জাদুঘরে নিদর্শনসমূহের সংখ্যা অনেক, যার ফলে বিভিন্ন কক্ষগুলোতে যথাযোগ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বস্তুগুলোকে সাজানো হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

১৫ মার্চ খুব সকালে আমরা ওমরাহ করবার উদ্দেশে সৌদি আরবে যাত্রা করলাম। কায়রোর হোটেলেই ইহরাম বাঁধলাম। দুটুকরো কাপড়— একটি পরিধানের জন্য, একটি গায়ে জড়ানোর জন্য। শুভ্র এ-দু'টি বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে একজন মানুষ সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়। সংসারের চিন্তা সে আর করতে পারে না, পার্থিব কোনো ইচ্ছা তাকে আকুল করতে পারে না, সেলাই ছাড়া শুভ্র একটি বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে এবং একখণ্ড গায়ে দিয়ে একজন মানুষ কাফনের পোশাক পরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপনীত হয়। নানাবিধ নিয়ম আছে, সে-নিয়ম সকলেই পালন করবার চেষ্টা করে। যেমন বিমানে আরোহণের পূর্বে অথবা কোনো যানবাহনে ওঠবার পূর্বে এ-কথা প্রত্যেকের উচ্চারণ করতে হয় অথবা উচ্চারণ করা কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, "মহান আল্লাহ্ এমন এক মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যার সাহায্য ছাড়া এই বাহনকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা সকলেই সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবো।"

আমরা মিশরীয় বিমানে দু'ঘণ্টার মধ্যে জেদ্দায় পৌঁছে গেলাম। জেদ্দায় পৌঁছেও একটি দোয়া করতে হয়— "হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট এই শহরের এবং এর অভ্যন্তরস্থ সকল কিছুর জন্য মঙ্গল কামনা করছি এবং এই শহরের অভ্যন্তরস্থ অমঙ্গল থেকে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক, যেখানে প্রবেশ করা শুভ এবং মঙ্গলজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যে স্থান থেকে বেরিয়ে আসা শুভ ও মঙ্গলজনক সেখান থেকে তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে আস এবং তোমার উৎস থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো।"

এভাবেই আমরা একটি প্রাচীন সমৃদ্ধবান ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে ইসলামের প্রাচীনতম কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার লাভ করলাম। ইতিহাসবিদরা বলেন যে, যথার্থ সেমীয় বা সেমেটিক জাতি আরব ভূখণ্ডেই অবস্থান করত এবং সেখান থেকেই তারা চতুর্দিকে নিজেদের ছড়িয়েছে। আরবরা আরব ভূখণ্ডকে জজিরাতুল আরব বলে। জজিরাতুল আরব অর্থাৎ আরব দ্বীপ। অবশ্য আরব ভূখণ্ড দ্বীপ নয়— এর তিনদিকে পানি কিন্তু উত্তরাঞ্চল ভূমিসংলগ্ন।

বিপুল আয়তনের এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ এলাকাই মরুভূমি। মাঝে মাঝে মরুদ্যান আছে। এই মরুদ্যানগুলোই একসময় এখানকার অধিবাসীদের জীবন ধারণের উৎস ছিল। তাছাড়া মধ্যযুগে বাণিজ্যের যাত্রাপথ হিসেবে আরব ভূখণ্ড প্রসিদ্ধ ছিল। এশিয়ার এবং আফ্রিকার বাণিজ্য সরঞ্জামগুলো আরব ভূখণ্ডের কিছু কিছু বিশিষ্ট পথ দিয়ে যাতায়াত করত। অবশ্য তেল আবিষ্কারের পর থেকে এখানকার এলাকাগুলো সমৃদ্ধির

www.nagorikpathagar.org

শিখরে আরোহণ করেছে এবং বিপুল সৌভাগ্যের আশ্বাস এরা পেয়েছে। আধুনিক প্রকৌশল এবং বিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে আরবরা তাদের দেশকে সমৃদ্ধবান করেছে। এদেশে প্রবেশ করবার ইচ্ছা সকল মুসলমানেরই থাকে, আমারও ছিল। এখানে প্রবেশের অধিকার পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম।

কোরান শরিফে আদ এবং সামুদ জাতির কথা আছে যারা আরব ভূখণ্ডের আদিম জাতিসত্তা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আদ জাতি হাজরামাউত অঞ্চলে অবস্থান করত। তারা ছিল দীর্ঘদেহী, সচল, বলিষ্ঠ এবং গর্বিত। তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের মধ্যে হুদ নামক একজন পয়গম্বর এসেছিলেন। তিনি তাদের সৎপথে আনবার চেষ্টা করছেন এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা হুদকে ব্যঙ্গ করে বলল, তুমি তো তোমার আল্লাহ্‌র কোনও নির্দেশ আননি। মনে হয় আমাদের কোনও দেবতা তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তখন তাদের দেশে প্রচন্ড খরা নামল, বৃষ্টি বন্ধ হল, শস্য পুড়ে গেল। তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে মক্কায় লোক পাঠাল। প্রার্থনা শেষে তিন রঙের মেঘ আকাশে দেখা দিল–সাদা, লাল এবং কালো। ঐশীবাণী এল, এ-তিনটি মেঘ থেকে একটি মেঘ বেছে নাও। প্রচুর বৃষ্টি আছে ভেবে তারা কালো রঙ বেছে নিল। মেঘখন্ড আদ জাতিদের ভূখন্ডের উপর থামল এবং প্রচণ্ড ঝড় ও ধ্বংস বর্ষণ করল। এভাবে অবিশ্বাসের কারণে আদ জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

সামুদ জাতি বাস করত উত্তর আরবে। হিকটক এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে। সামুদরাও তাদের পয়গম্বরের নির্দেশ মানেনি এবং অবিশ্বাসের কারণে তারাও ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত এ-সমস্ত অবিশ্বাসী জাতিদের জন্যও মক্কা ছিল পবিত্র নগরী।

লোককাহিনীতে এবং ইতিহাসে মদিনাও একটি শুদ্ধ ও পবিত্র নগরী। দক্ষিণ আরবের লোকগাঁথায় আসাদ কামিলের গল্প আছে— যিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধের মানসে মদিনা নগরী ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। পারস্য অভিযানে জয়যুক্ত হয়ে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন শুনলেন যে, তার পুত্র নিহত হয়েছে যাকে তিনি মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন। এ-খবর শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মদিনা শহরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। এ-খবর যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন বনি কোরায়জা গোত্রের দুজন ইহুদি ধর্মযাজক আসাদ কামিলের কাছে এলেন এবং বললেন, "হে রাজন, এমন কাজ নিশ্চয়ই আপনি করবেন না যাতে আপনার উপর অভিসম্পাত আসতে পারে।" আসাদ কামিল জিজ্ঞেস করলেন, "তার অর্থ?" উত্তরে তারা বললেন, "এ নগরী একজন প্রেরিত পুরুষের আবাসস্থল হবে। তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে এখানে আশ্রয় নেবেন। সেই মর্যাদাবান মুহূর্তের জন্য এ নগরী অপেক্ষা করছে।" আসাদ কামিল তাঁদের বাক্য মানলেন। এভাবে পবিত্র মদিনা নগরী রক্ষা পেল।

এ-দু'টি নগরীকে নিয়ে আরো অনেক উপাখ্যান আছে এবং সব উপখ্যানে নগরী দু'টির প্রতি পরমতম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় লোকদের মুখে শুনেছি যে, বিশ্ব সৃষ্টির সূত্রপাতেই বিধাতা এ-দু'টি নগরীকে মর্যাদাবান কাম্য নগরী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এগুলো ইতিহাসের কথা নয়, এগুলো বিশ্বাসের কথা। আল্লাহ্‌তায়ালা

www.nagorikpathagar.org

যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাগণকে তাঁকে সেজদা করতে বললেন তখন আজাজীল সেজদা করতে অস্বীকার করল। তার ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হল। লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সে মুহূর্তে ফেরেশ্তাগণ শংকায়, শ্রদ্ধায় এবং বিনয়ে আল্লাহ্‌র আসন আরশের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কাছে এই পরিক্রমণটি ভালো লাগল। হযরত আদম যখন মক্কায় এলেন তখন আরশের ছায়া অনুসরণ করে তিনি কাবা ঘর প্রথম নির্মাণ করেন এবং তার চতুর্দিকে পরিক্রমণ বা তাওয়াফের প্রথা প্রবর্তন করেন। সুতরাং লোকবিশ্বাস মতে মানব সৃষ্টির সূত্রপাতেই মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ নির্মিত হয়েছিল এবং তার চতুর্দিকে তাওয়াফ সেই সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছিল।

এ-রকম বিশ্বাসের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত হয়ে অনেক লোকগাঁথা সৃষ্টি করেছে। নিকলসন সাহেব 'এ লিটারেরী হিস্টরী অব দি আরবস' নামক গ্রন্থে এ-ধরনের অনেক লোককাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সেগুলোর ওপর নির্ভর করে আরবদের ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এ-সমস্ত কাহিনীর মাধ্যমে একটি সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, মক্কা এবং মদিনা নগরী দু'টি আরব ভূখণ্ডের প্রাচীনতম সম্মানিত স্থান। তীর্থভূমি হিসেবে মক্কা আদিমকালেও যেমন শ্রদ্ধেয় ছিল চিরকালই তেমনি শ্রদ্ধেয় আছে।

কায়রো থেকে ইজিপ্ট এয়ারে জেদ্দায় পৌছাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বিমানের ঘোষণা অনুসারে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট লেগেছিল। জেদ্দা বিমান বন্দরটি বর্তমানের পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর এবং আধুনিকতমও বটে। বর্তমানে তিনটি টারমিনাল নির্মিত হয়েছে— নর্থ টারমিনাল, সাউথ টারমিনাল এবং হজ্জ টারমিনাল। প্রতিটি টারমিনালই তাঁবুর আদলে গড়া। বহু দূর থেকে অথবা আকাশ থেকে হজ্জ টারমিনালকে আরাফাতের ময়দানের শুভ্র তাঁবুর বিন্যাস বলে মনে হয়। ছোট ছোট তাঁবুর আদলে পিলারের ওপরে অবস্থিত কংক্রিটের ছাদগুলো যেমন আধুনিক প্রকৌশল-প্রজ্ঞার পরিচায়ক তেমনি আরবের ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে ভাবগতভাবে সমন্বিত। অন্য দুটি টারমিনাল বিপুল আয়তনের তাঁবুর মতো। টারমিনালের অভ্যন্তরস্থ ব্যবস্থাপনাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত। হোবার ক্রাফটের মতো বাস নিচ থেকে দোতলায় উঠে আসে এবং প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার নিম্নগতি হয়ে মাটিতে নামে এবং বিমানের দিকেএগিয়ে চলে। বিমানের দরোজার কাছে এসে আবার বাসটি উঁচু হয় এবং বিমানের দরোজার সঙ্গে সংলগ্ন হয়। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা টারমিনালগুলোর আছে। তবে এখানকার সিকিউরিটি এবং কাস্টমস অত্যন্ত কঠোর ও নিয়মতান্ত্রিক। এর ফলে প্যাসেঞ্জারদের বেরিয়ে আসতে সময় লাগে।

আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমেছিলাম ১০টায়। কিন্তু সিকিউরিটি এবং কাস্টমস অতিক্রম করতে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। বিমান বন্দরে মি: খান বলে এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিঃ খান একজন প্রকৌশলী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর আলী আশরাফের একজন বন্ধু। আশরাফের নির্দেশেই খান সৌদি আরবে আমাদের দেখাশোনা করছিলেন। মক্কা নগরীতে হারাম শরিফের কাছেই

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিসের বিপরীতে পুরনো ধরনের বাড়ির চারতলার একটি ফ্ল্যাট আশরাফ ভাড়া করে রেখেছে। সে নিজে যখন মক্কায় আসে তখন এখানেই থাকে। আমাদের জন্য এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

বর্তমান বিমান বন্দর থেকে মক্কা নগরী ৮০ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু মসৃণ ও প্রশস্ত রাজপথ নিয়ে এর দূরত্ব অতিক্রম করতে ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। লিমোজিনে করে যেতে গাড়ির দ্রুত গতি অনুভব করাই যায় না, প্রশস্ত বলে পথে কোন বাঁধাও উপস্থিত হয় না। পথের দুদিকে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি। কিন্তু কোথাও কোথাও সরকারি চেষ্টায় জনপদ গড়ে ওঠেছে এবং বিপুল এলাকা জুড়ে ইমারত তৈরি হয়েছে। তাছাড়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৃক্ষ রোপণেরও প্রয়াস চলছে। মনে হয় ক্রমান্বয়ে জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত পথের দুধারে সবুজ গাছের সমারোহ দেখা যাবে। পথের দুদিকের দৃশ্যের নানাবিধ পরিবর্তন গড়ে ওঠেছে। এই পরিবর্তনগুলো আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার ফলেই ঘটেছে। বিপুল অর্থের ব্যবহারের সাহায্যে রুক্ষ উষ্ণ মরুভূমিকেও এদেশের সরকার সজীব জনপদে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

পথে যানবাহন বেশি ছিল না। অনেকটা নিষ্কণ্টক যাত্রায় আমরা মক্কা শরিফে এসে পৌঁছলাম। মক্কা শরিফে প্রবেশের মুখে প্রার্থনা করলাম, "হে আমার প্রভু, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি, তুমি মহান বিশ্বপালক, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং এই নগরীর পবিত্রতায় আমাকে আচ্ছন্ন করো।"

জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত যানবাহন জটিল এবং বিপুল না হলেও মক্কা শহরের অভ্যন্তরে যানবাহনের জটিলতা ছিল প্রচণ্ড। যদিও অনেক হাইওয়ে তৈরি হয়েছে এবং অনেকগুলো হাইওয়েকে ফ্লাই ওভারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তবু একই রাস্তায় গাড়ির চাপে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া বেশ দুরূহ বলে মনে হচ্ছিল। তবে এখানকার গাড়ির চালকরা অত্যন্ত দক্ষ ও হিসেবী। এখানে এক্সিডেন্ট খুব কম হয়। কেননা এক্সিডেন্ট হলেই গাড়ির চালকের ভীষণ শাস্তি পেতে হয়। কোনো গাড়ির চাপে কোনো পথযাত্রী নিহত হলে গাড়ি চালককে কয়েক লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম মাফ নেই।

এদেশে আইনের শাসন প্রচণ্ড এবং আইন এড়ানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। আইনে যা আছে অক্ষরে অক্ষরে তা পালিত হয় এবং সে-ক্ষেত্রে কোনোরকম ক্ষমা নেই। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা খুব নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কিন্তু এ-ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে মরুভূমির দুর্ধর্ষ মানুষগুলোকে শাসনে রাখা সম্ভবপর হত না। অবধারিত শাস্তি এড়াবার জন্য মানুষ আইন মান্য করে চলে।

রাস্তায় পথচারী পারাপারের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। গাড়ি চলছে তার মধ্যেই গাড়ির দিকে হাত দেখিয়ে মানুষ রাস্তা পারাপার করছে। মানুষ দেখলেই চলতি গাড়িগুলো গতি কমিয়ে আনে এবং মানুষকে পথ পেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। গাড়ীর প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে এটা যে কী করে সম্ভবপর হচ্ছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে পথচারী রাস্তা পার হচ্ছে তার একটি নিশ্চিন্ততা আছে যে, কোনো গাড়ির

www.nagorikpathagar.org

ড্রাইভার বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে তাকে চাপা দেবে না। রাস্তার ওপর মানুষেরই অধিকার বেশি, গাড়ির নয়।

ব্রাজিলে রিয়ো ডি. জেনিরো শহরে একটি ভিন্ন ব্যবস্থা দেখেছিলাম। গাড়ির ধাক্কা খেলে অথবা গাড়ির তলায় চাপা পড়লেই পথচারীকে সেখানে দোষী সাব্যস্ত করার হয় যার ফলে সে-দেশের পথচারীরা খুব সাবধান হয়ে পথ চলে। তবে দুর্ঘটনা সেখানে অনবরত হয় তার কারণ গাড়ির গতিবেগ সেখানে নিয়ন্ত্রিত নয়।

আরব দেশের ব্যবস্থাটাই আমার ভাল লাগল বেশি। সেখানে চালকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে এবং শাস্তি এড়াবার কোনো সুযোগ একেবারেই নেই বলে যানবাহনের গতি স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং চালকরা অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে গাড়ি চালায়। তাছাড়া গাড়ি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে, চালককে সব সময় গাড়ির সক্ষমতা সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হয়। সক্ষমতা সার্টিফিকেট অর্থাৎ রুট নেয়ার্দিনেস। সেখানকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, কারো মুখেই যানবাহন চলাচল ব্যাপারে কোনো বিরূপ মন্তব্য শুনিনি।

সৌদি আরবে বিচার ব্যবস্থাটা তাৎক্ষণিক অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় বিলম্বীকরণের কোনো সুযোগ নেই। কোথাও কোনো দুর্ঘটনা, সংঘর্ষ অথবা অন্যায় সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই বিচারের আয়োজন হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। আমার চাখের সামনে বিচারের ব্যবস্থার কোনো ঘটনা আমি দেখিনি। কিন্তু সৌদি আরবে অবস্থানকালে বাঙালি এবং অন্যান্য বিদেশী যাদের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মুখেই এখানকার বিচারের দ্রুত সমাধানের কথা আমি শুনেছি। সাক্ষ্য ব্যবস্থাটা আরবদের একটি ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য। হাদিসের শুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে বিভিন্ন সাক্ষ্যপরম্পরার সাহায্যে। সুতরাং সাক্ষ্যকে এদেশে চিরকাল মান্য করা হয়। এর ফলে সাক্ষীর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে সেটাকেই প্রমাণ হিসাবে মান্য করা হয়।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আইনের নিয়মতান্ত্রিক ধারায় বিচার ব্যবস্থাটা অত্যন্ত বিলম্বিত। সত্য নির্ধারণের জন্য নানাবিধ জটিল কলা-কৌশল তৈরি হয়েছে যার ফলে শেষপর্যন্ত সুবিচার হয় কি না এটা নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। তাছাড়া বিলম্বের কারণে বিচারের যথার্থ সিদ্ধি ঘটে কি না এ-নিয়েও প্রশ্ন ওঠে থাকে। সৌদি আরবে তাৎক্ষণিক বিচারের ফলে অন্যায়ের পুনরাবর্তন ঘটে না বললেই হয়।

নামাজের সময় দোকানপাট খোলা রেখে দোকানী মসজিদে চলে যাচ্ছে। খালি দোকানে বিপণী সজ্জা শোভা পাচ্ছে। কিন্তু দোকানের একটি বস্তুও চুরি হচ্ছে না। শাস্তি ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা এবং তাৎক্ষণিকতার কারণে এদেশে সততা নির্মিত হয়েছে। চুরি করলে মণিবন্ধ থেকে হাত কেটে ফেলে দেয়া হয়। এটা যতই আদিম এবং নিষ্ঠুর শুনাক কিন্তু এর ফলে চুরি করবার সাহস মানুষ হারিয়ে ফেলে। বিচারের এই আদিমতার কারণেই পাপ এবং স্খলনের সুযোগ যথার্থই কম।

আমি পূর্বেই বলেছি এখানকার শাসনব্যবস্থায় ক্ষমা বলে কোনো বস্তু নেই এবং

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমাকে লঘুকরণেরও কোনো পদ্ধতি নেই। কতগুলো ক্ষেত্রে ক্ষমা করবার অধিকার নির্যাতিত পক্ষের ওপর। ধরা যাক, আলফাতাহ বলে এক ব্যক্তি হাম্মদকে হত্যা করেছে। এখানে হত্যার বদলে হত্যা আইনের এই নিয়মে আলফাতাহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এক্ষেত্রে দণ্ডকে লঘু করবার একমাত্র অধিকার হাম্মাদের পুত্র কিংবা কন্যার। সেখানেও কিছু বিশিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে যা সর্বদা মান্য করা হয়।

একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের মানুষকে সংশয়মুক্ত এবং অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করা। সৌদি আরবের বিচার ব্যবস্থায় এই নীতি সর্বদা অনুসৃত হয়ে থাকে। মানুষে মানুষে মানবীয় সম্পর্কের যথার্থ বিকাশমানতার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রয়োজন এবং গ্লানিমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন।

সৌদি আরবে একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এখানে দেশের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়— কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক। এই নিয়মতান্ত্রিকতাই এদেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। ধর্মের অনুসরণ এবং ধর্মীয় নির্দেশাবলী পালন— এগুলোও দেশের আইনের আওতায় পড়ে। যেমন নামাজের সময় নামাজ পড়তে হবে, রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে ইত্যাদি। এগুলোর ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এগুলোকে কেউ ইসলামী আইন বলতে পারেন কিন্তু না বললেও কোন ক্ষতি নেই। তার কারণ সৌদি আরবে প্রত্যাহিকতা এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে ধর্মীয় আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক মানুষের কর্মধারার মধ্যে ধর্মীয় রীতিপ্রকরণগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা ধর্মান্ধতা এই ধরনের শব্দ একটি সমাজে তৈরি হয়। কিন্তু সৌদি আরবে এই ধরনের শব্দ কখনোই উচ্চারিত হয় না। এখানে ধর্মান্ধতার প্রশ্ন নেই, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন নেই। এখানে শুধু আইনগত ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন। এদেশে বিভিন্ন ধরনের আইন নেই অর্থাৎ ধর্মীয় আইন কিংবা সামাজিক আইন অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে বিচারের কোন ব্যতিক্রম নেই।

আমি মাত্র সাতদিন সেখানে ছিলাম। সাতদিনে দেশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না অথবা তার ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু তার শাসনব্যবস্থা অথবা নিয়মের সুনিশ্চয় পদক্ষেপকে অনুভব করা যায়। এদেশে বহিরাগত অনেকে ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়া আত্মগোপন করে থাকে। এদেশে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই একরম ঘটে। এদের জন্য পুলিশ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় এবং পথেঘাটে এ-সমস্ত পলাতককে পেলে লোহার বেষ্টনী দেয়া খাঁচার মধ্যে ভরে প্রকাশ্যে পথ দিয়ে হাজতে নিয়ে যায়। এরকম খাঁচা বড় বড় রাস্তার পাশে প্রায়ই দেখা যায়। কখন যে এই সমস্ত খাঁচা সচল হয়ে ওঠবে বলা কঠিন। খাঁচাগুলো চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার বহন করার মতো। একজন বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, "এই ব্যবস্থাটা যতই বন্য মনে হোক ব্যবস্থাটা কিন্তু কঠোর এবং নিশ্চিত। এমনি গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর কিন্তু লোহার খাঁচা থেকে পালানো যায় না।"

পৃথিবীর মানুষ যেখানে আছে সেখানে পাপ এবং পুণ্য উভয়ই আছে। অনেক পাপ

www.nagorikpathagar.org

লোকদৃষ্টির আড়ালে থাকে। আড়ালে ঘটে বলেই সেগুলোর বিচার হয় না এবং সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি না। সৌদি আরবেও এ-ধরনের পাপ যে গোপনে হয় না তা নয়। লোকলোচনের আড়ালে যা ঘটে সেগুলোর দ্বারা একটি জাতিসত্তার কর্মবিধি বিশ্লেষণ করা উচিত হবে না। অর্থের প্রাচুর্যের ফলে ঐশ্বর্যের অহমিকা মানুষকে উদ্ধত করে এবং আইনকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে অপরাধ চলে। অবশ্য ধরা পড়লে যে শাস্তি হবে তা সে জানে।

এদেশে সিনেমা হল নেই কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষের ভিসিআর আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সুবিধা নিয়ে এদেশের মানুষ প্রতাপী হয়েছে এবং সে প্রতাপ কখনো কখনো পাপ সৃষ্টি যে করবে তা স্বাভাবিক। একটি উর্বর মরুভূমি ক্রমান্বয়ে সজীবতার প্রাচুর্যে উচ্ছলিত হয়েছে। এই উচ্ছলতার বন্যায় এদেশের মানুষ চমৎকৃত, আনন্দিত, পরিতৃপ্ত এবং উদ্ধত! এককালে দীন ও দরিদ্র অবস্থা থেকে এদেশের মানুষ সৌভাগ্যের চরমতম শিখরে আরোহণ করেছে। এ সৌভাগ্য আল্লাহ্‌রই দান। সুতরাং বিশ্ব বিভুর কাছে প্রতিনিয়ত মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন এখানে অনেক বেশি।

www.nagorikpathagar.org

মক্কা একটি রহস্যময় নগরী। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে এই নগরীতে প্রবেশ করবার আকাঙ্ক্ষা করেছে এবং প্রবেশ করে স্বস্তি লাভ করেছে। আরব ভূখণ্ডে বহু নগর স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থে মক্কা নগরী কখনো সমৃদ্ধশালী ছিল না। যে-স্থানে মক্কা অবস্থিত একসময় সে-অঞ্চল ছিল শুষ্ক এবং ঊষর। এ-পথ দিয়ে যাত্রীবাহী উটের কাফেলা চলাচল করত এবং অন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্যারাভাঁও মক্কা শহরের কাছ দিয়ে যেত। কিন্তু এ-সমস্ত কিছু মক্কাকে সমৃদ্ধ করেনি। মক্কা সমৃদ্ধ এবং সম্মানিত হয়েছিল পৃথিবীর পবিত্রতম গৃহের জন্য, যে-গৃহকে আমরা কাবা গৃহ বলে থাকি। মক্কা নগরী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর মাতৃসমান। পৃথিবীর সকল বিশ্বাসীর কাছে এই নগরীর ঐশ্বর্য হচ্ছে অলৌকিক ঐশ্বর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং এমন এক ঐশ্চর্য যা মানব আত্মাকে উদ্বুদ্ধ এবং অলংকৃত করে।

মক্কার পূর্বে একসময় এক সংকীর্ণ উপত্যকার ওপর জবল আল উবায়েস নামক পর্বত অবস্থিত ছিল। কাবা গৃহের বেষ্টনীর বাইরে জবল আল উবায়েসের অবস্থান এখনো আছে। কিন্তু তার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পর্বতের শিরোদেশ সমান্তরাল করে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে এবং পর্বতের পাদদেশ খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাবা গৃহটি প্রস্তরে নির্মিত একটি কিউবের মতো। কালো আবরণ দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখা হয়। এর এক কোণ হিজরে আসওয়াদ প্রোথিত আছে। প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসীগণ কাবা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

আরব দেশের ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস অনুসারে কাবা গৃহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন হযরত আদম (আঃ)। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন মানব জাতির পিতা। হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় প্রবল বন্যায় গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইলের সাহায্যে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর অনবরত সংস্কার এবং পুনঃনির্মাণের মধ্যে দিয়ে কাবাঘর বর্তমান অবস্থায় এসেছে, তবে এর মূল আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

একসময় চিন্তার অধোগতির এক পর্যায়ে আরব দেশীয়রা কাবা গৃহের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করে। ৩৬০টি মূর্তি কাবাগৃহে স্থাপিত হয়েছিল। রসূলে খোদা এসে চিরকালের জন্য কাবা গৃহকে পৌত্তলিক শাসনমুক্ত করলেন এবং মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করলেন।

কাবা গৃহের নিকটেই জমজমের পানির উৎস। কোনো একসময় এই জমজম বালু চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। রসূলে খোদার পিতামহ আবদুল মুত্তালিব বহু

www.nagorikpathagar.org

অনুসন্ধানের পর জমজমকে আবার আবিষ্কার করেন। রসূলে খোদার জন্মের পূর্বে আবদুল মুত্তালিবই ছিলেন কাবা গৃহের খাদেম এবং জমজম কূপের প্রহরী। আরবিতে দু'টি শব্দ আছে। একটি হচ্ছে সিকায়া অন্যটি হচ্ছে হাজাবা। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে পানির ব্যবস্থাপক, দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে কাবার পরিচালক। এ-দুটোর দায়িত্বই আবদুল মুত্তালিবের উপর ন্যস্ত ছিল।

একদিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মক্কার পথে বেরিয়েছিলেন। কাবা গৃহের বাইরের চত্বরে কুতিলা নামক বনি আসাদ গোত্রের একজন রমণী বসে ছিল। আবদুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই কুতিলা চমকে উঠল। সে লক্ষ্য করল আবদুল্লাহর কপালে একটি উজ্জ্বল দীপ্তি উদ্ভাসিত রয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আবদুল্লাহ বললেন, যেখানে আমার পিতা নিয়ে যাবেন।

কুতিলা তখন বলল, তুমি আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে একশ উট দেব। তুমি আমার হও এবং আমাকে বিবাহ করো।

কুতিলার নির্লজ্জ প্রস্তাবে আবদুল্লাহ উত্তর করলেন, আমি আমার পিতার নির্দেশে তাঁর সঙ্গে চলেছি। আমি তাঁকে অমান্য করতে পারি না।

পিতা আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে আবদুল্লাহ ওহাব আবদুল মান্নাফের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহ হয়। বিবাহের পর আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের গৃহে গেলেন। সেখানে তিনদিন এবং তিন রাত্রি যাপন করলেন। এভাবে বিবাহ নিশি উদ্‌যাপনের পর আবদুল্লাহ যখন পথে বেরিয়েছেন পথে আবার তিনি কুতিলাকে দেখলেন, কিন্তু এবার কুতিলা আবদুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করল না। কুতিলা তার পিতা ওয়ারাকা ইবনে তোফায়েলের কাছ থেকে শুনেছিল যে, মক্কায় আল্লার প্রেরিত একজন নবী আসবেন। আবদুল্লাহর কপালে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে কুতিলা ধারণা করেছিল যে, আবদুল্লাহই সেই নবীর পিতা হতে যাচ্ছেন। তাই কুতিলা আবদুল্লাহকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন আবদুল্লাহর কপালে সেই জ্যোতি আর দেখতে পেল না। তাই জ্যোতিহীন আবদুল্লাহর প্রতি তার আর আকষর্ণ ছিল না।

আবদুল্লাহ কুতিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন তুমি আমার প্রতি এত আকর্ষণ দেখিয়েছিলে, আর আজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছ না, এটা কেমন কথা!

কুতিলা তখন বলল সেই জ্যোতির কথা, যে জ্যোতি সে আবদুল্লাহর কপালে দেখেছিল।

আবদুল্লাহ তখন তাঁর বিবাহের কথা বললেন।

কুতিলা তখন বলল, সেই রমণী ধন্যা যে তোমার জ্যোতিকে ধারণ করেছে এবং সে যথাসময়ে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীকে জন্ম দেবে।

www.nagorikpathagar.org

একদিন আমিনা একটি শব্দ শুনতে পেলেন, "তুমি তোমার গর্ভে একটি মহান শিশুকে ধারণ করছ, যে তার জনগণের প্রধান হবে। যখন সে জন্মগ্রহণ করবে তখন তার নামকরণ কর মোহাম্মদ এবং তার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

কয়েক সপ্তাহ পর সন্তান জন্মের পর আমিনা তাঁর চাচার বাসায় অবস্থান করছিলেন। তিনি আবদুল মুত্তালিবকে খবর দিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব শিশুকে ক্রোড়ে করে কাবা গৃহে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন এবং পরে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এলেন।

তখনকার দিনে আরব দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি প্রথা ছিল যে, তারা নবজাত শিশুকে মরুভূমিতে কোন না কোন বেদুঈন পরিবারের মধ্যে লালন পালনের জন্য পাঠিয়ে দিত। সে-সময় শিশুমৃত্যুর হার আরব দেশে খুব বেশি ছিল। সম্ভবত সেটা একটি কারণ, সে-কারণে উন্মুক্ত মরুভূমিতে বেদুঈন পরিবারের মধ্যে শিশু সন্তানকে পাঠিয়ে দেওয়া হত যেন তারা মরুভূমির উন্মুক্ততায় আলো, বাতাস এবং উষ্ণতার প্রশ্রয়ে স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠে। তাছাড়া বেদুঈনদের উচ্চারিত আরবি ভাষা ছিল পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ। জীবনের সূত্রপাতে একটি শিশু যেন পরিশুদ্ধ আরবি উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। কুরাইশগণের সন্তানরা এভাবে শিশুকাল থেকে প্রায় ৮ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত মরুভূমিতে লালিত-পালিত হত।

মরুভূমিতে কিছু কিছু বেদুঈন পরিবার ছিল যারা এভাবে শিশু লালন-পালনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে এই রকম শিশু লালন-পালনের অভিজ্ঞ একটি গোত্র ছিল। তার নাম বনী সাদ গোত্র। আমিনা চাচ্ছিলেন এ-গোত্রের কোন রমণীর কাছে তাঁর সন্তানকে সমর্পণ করতে। এই গোত্রের এক রমণী ছিলেন হালিমা। হালিমা তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পালনযোগ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় এসেছিলেন। তাঁদের অঞ্চলে তখন খরা পড়েছিল। তাঁরা তাই একজন ধনী পরিবারের সন্তানের সন্ধানে ছিলেন। আমিনার সন্তানকে গ্রহণ করতে প্রথমে হালিমার দ্বিধা ছিল, কেননা শিশু মোহাম্মদ ছিলেন এতিম। হালিমা ভাবছিলেন, "একটি এতিম শিশুকে নিয়ে আমরা কতটাই-বা লাভবান হব?" আমিনার ঐশ্বর্য ছিল না। তাঁর স্বামী মৃত্যুর আগে প্রভূত বিত্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। মৃত্যুর সময় তিনি যা রেখে গিয়েছিলেন তা হচ্ছে পাঁচটি উট এবং এক পাল ভেড়া-ছাগল এবং একজন দাসী কন্যা। আবদুল্লাহর ছেলে একজন সম্মানিত পরিবারের সন্তান ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দরিদ্র ছিলেন। হালিমা সমৃদ্ধমান কোন পরিবারের শিশুকে না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমিনার সন্তানকে গ্রহণ করেন।

হালিমার স্তনে মুখ রাখতেই প্রচুর দুধ নির্গত হতে লাগল। সেই দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে শিশু ঘুমিয়ে পড়ল। হালিমার সঙ্গে একটি উষ্ট্রী ছিল। খরার কারণে এবং খাদ্যের অভাবে উষ্ট্রীর স্তনে দুধ ছিল না। কিন্তু আমিনার শিশু পুত্রকে লালনের জন্য গ্রহণ করার পর পরই উষ্ট্রী দুগ্ধবতী হল। এই অলৌকিক ঘটনায় হালিমা বিস্মিত হলেন। পরবর্তীকালে হালিমা শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে বনি সাদ গোত্রের প্রত্যাবর্তনের পরের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন : আমরা যখন বনি সাদ এলাকা ত্যাগ করে মক্কায় গিয়েছিলাম তখন প্রবল খরায় আমাদের পালিত পশুগলো দুগ্ধহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে যখন আমরা ফিরলাম তখন দেখলাম পালিত পশুগুলো দুগ্ধবতী হয়েছে। আমরা দুগ্ধ দহন করে কূল পেলাম না। এত প্রচুর দুগ্ধ ছিল যে, কল্পনা করা যায় না। শিশু মোহাম্মদের আগমনের পর আমাদের অঞ্চলের খরা চলে গেল এবং আমাদের সকল অসুবিধা দূর হল। বালক মোহাম্মদ অল্প দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠল এবং স্বাস্থ্য সম্পদে বড় হয়ে উঠল। তার দুবছর বয়সের সময় তাকে আমরা মক্কাতে নিয়ে গেলাম তার মাকে দেখাবার জন্য।

মক্কাতে তখন মহামারী ছিল। তাই আমিনা শিশুকে আবার আমাদের কাছে ফেরত দিলেন এবং বললেন, একে তোমরা তোমাদের কাছে মক্কার আবহাওয়া থেকে দূরে রাখ যেন শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

এরপর আমরা আমাদের গোত্রে আবার ফিরে আসি। ফিরে আসার কিছুদিন পর বালক মোহাম্মদ আমার ছেলে অর্থাৎ তার দুধ ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমার ছেলে দৌড়ে এসে বলল, "দুই জন সাদা পোশাক পরা পুরুষ আমার কোরেশ ভাইকে মাটিতে শুইয়ে তার বুক চিরে কী জানি করছে।'

তখন আমি এবং আমার স্বামী সেখানে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম বালক মোহাম্মদ ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার কী হয়েছে', জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, 'সাদা পোশাক পরিহিত দুজন লোক আমাকে চিৎ করে শুইয়ে আমার বুক চিরে কী যেন খুঁজছিল!'

এই বক্ষ বিদারণের কাহিনী রসূলে খোদা পরবর্তীকালে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অনেকগুলো হাদিসে এই বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিবি হালিমার চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। রসূলে খোদাকে শৈশবে হালিমা যখন লালন পালন করতেন তখন হালিমার কন্যা শাইমা শিশু নবীকে দোলনায় দোলা দিত, কোলে নিয়ে নাচত এবং গান গাইত।

রসূলে খোদার ধাত্রীমা ছিলে বনি সাদ গোত্রের বংশোদ্ভূত। এই গোত্র সমগ্র আরব দেশে যথার্থ আরবি উচ্চারণের জন্য এবং ভাষার লালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গোত্রের মানুষের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সুললিত এবং মার্জিত ছিল। রসূলে খোদার শৈশবকাল এই বনি সাদ গোত্রের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। আরবি ভাষার ওপর তাঁর নিজের অধিকার সম্পর্কে রসূলে খোদা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, আমি আরবি ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং আমি আরবি ভাষার অপূর্ব লালিত্যের অধিকারী। এর কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরাইশ বংশে, আমি প্রতিপালিত হয়েছি বনি সাদ গোত্রে।

শিশু নবীর বক্ষ বিদারণের কথা শুনে হালিমা এবং তাঁর স্বামী হারিস ভীত সন্ত্রস্থ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন সম্ভবত এই বালকের ওপর কোন প্রেতাত্মা আশ্রয় করেছে অথবা তাঁর ওপর কোন অশুভ প্রভাব পড়েছে। সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শিশু মোহাম্মদকে তাঁর মাতার কাছে রেখে আসাই সমীচীন। হালিমা শিশু মোহাম্মদকে মক্কায় নিয়ে গেলেন এবং মাতা আমিনার কাছে সমর্পণ করলেন। আমিনা সন্তানকে নিজের

www.nagorikpathagar.org

কাছেই রাখলেন। বালক মোহাম্মদ মাতার কাছে তিন বৎসর কাল থাকলেন এবং সকলের প্রিয়ভাজন হলেন, বিশেষ করে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামজা এবং কন্যা শাফিয়ার সঙ্গে বালক মোহাম্মদের নিবিড় সখ্য স্থাপিত হয়। হামজা ছিল তাঁর সমবয়সী এবং শাফিয়া কিছুটা ছোট।

বালক মোহাম্মদের বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তাঁর মাতা আমিনা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরীবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। উত্তর পথের যাত্রী একটি কাফেলার সঙ্গে আমিনা যোগ দিলেন। আমিনা একটি উটের পিছে ছিলেন এবং বালক মোহাম্মদ দাসী কন্যা বারাকার সঙ্গে অন্য একটি উটে ছিলেন। এই যাত্রার কথা রসূলে খোদা পরবর্তীকালে আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, ইয়াসরীবে অবস্থানকালে তিনি পুকুরে সাঁতার কাটতে এবং ঘুড়ি ওড়াতে শিখেছিলেন। ইয়াসরীব থেকে ফিরতি পথে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি আবওয়া অঞ্চলে অবস্থান করেন। কাফেলা মক্কার পথে চলে যায়। এখানেই আমিনার মৃত্যু হয় এবং এখানেই তিনি সমাহিত হন। পরে অন্য একটি কাফেলার সঙ্গে বারাকা মোহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় দাদা আবদুল মুত্তালিব বালক মোহাম্মদের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন।

আবদুল মুত্তালিব সব সময় কাবা গৃহের নিকটে থাকতে ভালবাসতেন। বালক মোহম্মদ তাঁর সঙ্গে কাবার নিকটে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন দাদা এবং নাতি একসঙ্গে কাবা গৃহের পাশে এসে বসতেন। আবদুল মুত্তালিব যেখানেই যেতেন সেখানেই নাতিকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যখন তিনি মক্কার প্রধানদের আলোচনা সভায় যোগ দিতেন সেখানেও বালক মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গে থাকতেন। আলোচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করবার জন্য বালকের কাছেও কৌতূহলবশত প্রশ্ন রাখতেন এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বলতেন, এই বালকের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

মাতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবু তালিবের হাতে বালক মোহাম্মদকে সমর্পণ করেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন থেকেই বালক মোহাম্মদ চাচা আবু তালিবের গৃহে তাঁর স্নেহ ও সমর্থনে বড় হয়ে উঠতে থাকেন।

আবদুল মুত্তালিব একসময় খুব ধনী ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তাঁর বিত্ত অনেক কমে আসে। মৃত্যুর সময় তাঁর যা ছিল তা তাঁর ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এভাবে বন্টন হওয়ার ফলে আবু তালিবের ভাগে যা পড়ল তা অত্যন্ত নগণ্য। আবু তালিব পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র অবস্থায় পড়লেন। সুতরাং অর্থ উপার্জনের জন্য বালক মোহাম্মদকেও পরিশ্রম করতে দিতে তিনি বাধ্য হলেন।

বালক মোহাম্মদ মেষ চারণ করা আরম্ভ করলেন। এই মেষ চারণ করতে গিয়ে তিনি প্রান্তরে, উপত্যকায় এবং পর্বতে পরিভ্রমণ করতে শিখলেন। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হল। মেষ চারণ ছাড়াও চাচা আবু তালিবের সঙ্গে তিনি বাণিজ্যে যাওয়া শুরু করলেন। যখন তাঁর বয়স ৯ (কারো কারো মতে ১২)

www.nagorikpathagar.org

তখন আবু তালিবের সঙ্গে এক বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে তিনি সিরিয়ায় এলেন।

সিরিয়ার নিকটে যেখানে কাফেলা থেমেছিল সেখানে বাহিরা নামক একজন খ্রিস্টান সাধু বাস করতেন। বাহিরা প্রাচীন খ্রিস্টান গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হয়েছিলেন যে, আরবদের মধ্যে একজন পয়গম্বর আসবেন। তিনি প্রায়ই দেখতেন যে, সিরিয়া যাত্রী কাফেলা সিরিয়ার পথে তাঁর আস্তানার কাছে এসে থামে। কিন্তু এবার তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এই কাফেলার মাথার ওপর এক খণ্ড মেঘ ছায়া দিয়ে চলেছে। তিনি আরও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন কাফেলা যখন একটি গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসেছে তখন মেঘখণ্ডও গাছের ওপর স্থির হয়ে রইল। সাধু বাহিরা অনুভব করলেন যে, মেঘের এই যে ছায়া প্রদানের একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক ইঙ্গিত আছে। তিনি তখন কাফেলার লোকজনকে তাঁর মন্দিরে খাদ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কোরাইশগণ মোহাম্মদকে উটগুলো দেখার জন্য গাছের তলায় রেখে নিজেরা মন্দির অভ্যন্তরে গেল। বাহিরা এদের মুখের দিকে তাকিয়ে অলৌকিক কিছু লক্ষ্য করলেন না। তিনি তখন কোরাইশগণকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এখানে কি আপনারা সবাই এসেছেন?'

কোরাইশগণ বললেন : 'না একজন বালককে গাছের তলায় রেখে এসেছি।'

বালক মোহাম্মদকে তখন বাহিরার মন্দিরে ডেকে আনা হল। বাহিরা মোহাম্মদের দিব্যকান্তি দেখে অভিভূত হলেন এবং তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করে সিদ্ধান্ত এলেন যে, এই সেই অলৌকিক পুরুষ যাঁর আগমনের বার্তা তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থে পেয়েছেন। বাহিরা আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বালকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

আবু তালিব বললেন, সে আমার সন্তান।

সাধু বাহিরা বললেন : 'এ বালক আপনার সন্তান হতে পারে না। এর পিতা জীবিত নেই।' আবু তালিব তখন বললেন : 'এ আমার ভ্রাতার পুত্র, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার ভ্রাতা জীবিত নেই।'

বাহিরা তখন বললেন : 'আপনার ভ্রাতার পুত্রকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং ইহুদিদের কাছ থেকে তাঁকে দূরে রাখুন। তাঁর বিপদের আশংকা আছে। আপনার ভ্রাতার পুত্রের জন্য একটি অসাধারণ ভবিষ্যৎ রয়েছে।'

সমগ্র আরব দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল মুসলমানের মধ্যেই এই কাহিনী পরিচিত এবং বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচিত। সত্যিই তো তিনি আলো, বিশ্বাসের আলো, চৈতন্যের আলো এবং আমাদের অস্তিত্বের আলো। এই আলোর উপমা রসূলে খোদার জীবন কথায় বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। তিনি নিজে একবার বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতি দিয়ে আমাকে তৈরি করেছেন এবং আমার জ্যোতি দিয়ে বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন।" এই জ্যোতির্ময়তাই ইসলামের মূল সত্য। আমরা কাবা গৃহে যাই এই জ্যোতিকে অনুভব করার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

আমি হারেম শরিফের ভেতরে প্রবেশ করে কেমন এক প্রকার অনন্যতা অনুভব করলাম। মনে হল বিশ্বের সমস্ত সম্পদ এখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং আমি সেই সম্পদকে স্পর্শ করতে যাচ্ছি। হারেম শরিফের চত্বরের মধ্যে অগণিত মানুষ পড়ে চলেছে, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক— হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকটে উপস্থিত, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছি। তুমি একক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোনো শরিক নেই। নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা তোমার এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধিপত্য তোমার। হে প্রভু তোমার দাসানুদাস তোমার নিকটে উপস্থিত, তুমি তাকে গ্রহণ করো।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে জামাতে আছরের নামাজ আদায় করলাম এবং তারপর কাবা গৃহে তাওয়াফ আরম্ভ করলাম। তাওয়াফের কতগুলো নিয়ম আছে সেগুলো সকলকে মানতে হয়। এই নিয়ম পালন করে তাওয়াফ করার মধ্যে একটি আনন্দ আছে। বহু লোক এই প্রথায় কাবা গৃহে প্রদক্ষিণ করেছে। এর মধ্যে একটি সম্মিলিত সৌষ্ঠব আছে এবং একটি মনোহারিত্ব আছে। তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার সময় সকলেই বলে, হে আল্লাহ্ তোমার নামে আরম্ভ করছি এবং ঘোষণা করছি যে, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং তুমিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার রহমত এবং সালাম রাসূলে খোদার ওপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির ওপরও বর্ষিত হোক। হে মহামহিম! তোমার অনুগ্রহ ছাড়া ভালো কাজ করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকবার কোনো উপায়ও আমাদের নেই।

প্রথম প্রদক্ষিণের সময় সকলেই বলতে থাকে, হে আল্লাহ্ তোমার নামে কাবা গৃহে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করছি। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি ছাড়া আর উপাস্য নেই, হে আল্লাহ্ তোমার ওপর বিশ্বাস এনে, তোমার গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস রেখে তোমার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার পালনার্থে তোমার প্রিয় নবী এবং বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করে আমি এই প্রদক্ষিণ করছি। আমি তোমার নিকট ইহকাল এবং পরকালের সুখ-শান্তি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণের সময় সবাই বলে, হে আল্লাহ্ ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও, ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করো, পৃথিবীর যাবতীয় পাপ আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও এবং আমাদের সকলকে সত্য ও ন্যায়ের দলভুক্ত করো।

এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং বিভিন্ন প্রদক্ষিণে একই প্রার্থনা বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিতে উচ্চারিত হয়। কাবা প্রদক্ষিণের শেষে আল্লাহ্‌র কাছে আর্তি জানাতে হয়। প্রার্থনা জানতে হয়। এ-প্রার্থনা প্রত্যেক মানুষ আপন আন্তরিকতায় নিজের মতো করে করবে এটাই কাম্য। আমি হিজরে আসওয়াদ চুম্বন করে কাবা গৃহের দেয়ালে হাত রেখে একটি প্রার্থনা করেছিলাম, "হে আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে যখন বঞ্চনা, যখন অভিশাপ-অস্বাচ্ছন্দ্য তখন তুমি আমাকে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণের সুযোগ দিয়েছ। এখানে আমি একটি অনন্তকালীনতার সাক্ষী হয়েছি, একটি পরিচ্ছন্নতার সাক্ষী হয়েছি। হে পবিত্র গৃহের অধিকর্তা, তুমি আমাকে এবং আমার পূর্ব পুরুষ সকলকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে অপরাধ এবং পাপ থেকে মুক্তি দাও। তুমি দয়ালু, দাতা, করুণাময়, হিতকারী ও মঙ্গলময়, আমার প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডকে শোভন এবং সুন্দর করে দাও। ইহকালের অপমান থেকে এবং পরকালের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি আজ তোমার করুণাপ্রার্থী হয়ে তোমার সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমার প্রার্থনা এই— আমি জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে-সমস্ত পাপ করেছি এবং যে-সমস্ত স্খলনকে এড়াতে পারিনি সেগুলো থেকে আমাকে মুক্ত করো, আমার কর্মকে সঠিক করো, আমার অন্তরকে পবিত্র করো, আমার ভবিষ্যৎকে আলোকিত করো এবং আমাকে শুভ ও কল্যাণের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করো।"

কাবা গৃহের নিকটেই মকামে ইব্রাহীম। মকামে ইব্রাহীম একখণ্ড পাথর। এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম পুত্র ইসমাইলের সাহায্যে কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এই পাথরের ওপর হযরত ইব্রাহীমের পদচিহ্ন অংকিত আছে। বর্তমানে কাবাগৃহ থেকে কিছুটা দূরে একটি কাঁচের গম্বুজের মধ্যে এটি রক্ষিত। মকামে ইব্রাহীমে নিকট উপস্থিত হয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আমি সায়ী করতে গেলাম। সায়ী হচ্ছে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত সাতবার পদব্রজে গমন। বিবি হাজেরা তাঁর সন্তানের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে একবার সাফা পর্বতের ওপরে উঠেছিলেন এবং আর একবার দৌড়ে গিয় মারওয়া পর্বতের ওপরে উঠেছিলেন। এভাবে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত তিনি ছোটাছুটি করেছিলেন। হাজেরার মাতৃহৃদয়ে আকুলতার প্রতীক হিসেবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিশ্বাসীগণ সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্বতে দৌড়ে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতি রমণীকুলকে এহেন সম্মান দেখায়নি।

বিবি হাজেরা মাতা ছিলেন এবং মাতা হিসেবে সন্তানের জন্য তাঁর একটি আকুল প্রার্থনা ছিল। অনন্তকাল ধরে সেই আকুলতা এবং প্রার্থনার কথা বিশ্বাসীগণ স্মরণ করে চলেছে। এই শ্রদ্ধা মাতৃহৃদয়ের করুণার প্রতীক, মাতার আকুলতার প্রতীক এবং মমতার প্রতীক। এই অতুলনীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সকলকে স্তম্ভিত করে। শ্রদ্ধার এই বিশালতা, বিপুলতা এবং সর্বকালীনতার তুলনা নেই। সাফা পর্বতের ওপর উঠে সকল বিশ্বাসীকে প্রার্থনা করতে হয় ও বলতে হয়, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করো, তোমার অনুগ্রহের সমস্ত কপাট আমার জন্য খুলে দাও, বিফলতা এবং অসম্মান থেকে আমাকে রক্ষা করো।

www.nagorikpathagar.org

সাতবার যে সায়ী করতে হয় সেই সায়ীর প্রতিবারের জন্য একটি করে দোয়া আছে। সাধারণত দলের একজন উচ্চ স্বরে এসব দোয়া পড়তে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সাথে সাথে কথাগুলো উচ্চারণ করেন। এতে একটি সুন্দর কলগুঞ্জন প্রবাহিত হতে থাকে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এই এলাকাটি সুন্দর একটি বিস্তারিত ও প্রশস্ত মর্মর প্রস্তরে নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে বর্তমানে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ কক্ষটি পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের নিদর্শনস্বরূপ মূল পাহাড়ের কিছু অংশ প্রোথিত রাখা হয়েছে যে অংশ দুটো সমতল থেকে একটু উঁচু। মানুষ যখন সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে করতে দ্রুতবেগে ধাবমান হতে থাকে তখন সংসারের কোনো শব্দই সে শুনতে পায় না। পৃথিবীর সকল ইচ্ছাকেই সে বিসর্জন দেয় এবং একটি অনন্ত তন্ময়তায় সে নিমগ্ন হয়। একজন মানুষের জীবনে এ অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। কবে কোন অতীতে একটি আকাঙ্ক্ষিত মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য শুভাশীষ সন্ধান করেছিলেন আজও ব্যাকুল হয়ে আমরা তার অনুকরণ করে চলেছি। বিপুল বিশ্বের মানুষ একটি আকাঙ্ক্ষায় এখানে মিলিত হয়েছে। সে আকাঙ্ক্ষা শান্তির এবং পাপ মুক্তির। সে আকাঙ্ক্ষা গ্লানি থেকে নিষ্ক্রমণের, সে আকাঙ্ক্ষা অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে মুক্তির।

একসময় এ-অঞ্চল ধূলিধূসিরত রুক্ষ পর্বতসংকুল ছিল। তখন মানুষ সূর্যতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করত। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালু তাকে পীড়িত করত। প্রস্তর কণাগুলো মানুষের পায়ের আঘাতে ছুটে যেত চতুর্দিকে। অদূরে অপেক্ষমান উটের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে-সময় মানুষ যে কষ্ট সহ্য করেছে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা অনুভব করা অসম্ভব। আমরা আধুনিক জীবনের সর্বপ্রকার সৌজন্যকে গ্রহণ করে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করছি এবং সাফা মারওয়ার পথে পদযাত্রা করছি। আমরা কল্পনায় চিরকাল যে বিপুল মরুভূমিতে মানুষ বিপদসংকুলতায় তার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত সে চিত্রটাই ভেসে ওঠে। ১৯৫৪ সালে আমার পিতা হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে পথের কষ্টের বিবরণ দিয়েছিলেন। জনতার চাপে প্রাণ সংশয়ের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সমস্ত কিছু অতিক্রম করে একটি অপরিসীম তৃপ্তির কথা বলেছিলেন। আমার কল্পনায় দুর্ভরতায় সুকঠিন পরীক্ষার শেষে শান্তির বরাভয়ের একটি চিত্র ছিল। সে চিত্র ভবিষ্যতে আর কখনো জাগ্রত করা যাবে না। এখনকার দিনে পুরনো দিনের অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব। হয়তো সেগুলোর প্রয়োজনও নেই।

এভাবে ওমরাহ যখন শেষ হল তখন আমি মাথা কামিয়ে ফেললাম। এটাই রীতি। কেশরাশির বিলাস থেকে এই মুক্তি মানুষকে সংসারের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। ওমরাহর সময় আরাফাত-মীনা ময়দানের যেতে হয় না। কিন্তু আমি পরের দিন আরাফাত এবং মীনা দেখতে গিয়েছিলাম। আরাফাতের নিকটে জেবল রহম অর্থাৎ শান্তির পর্বত রয়েছে। এই পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়ে রসূলে খোদা তাঁর জীবনের শেষ খুতবা দিয়েছিলেন। পর্বতটি সুরক্ষিত। ঘোরানো সিঁড়ি করে দেওয়া আছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে মানুষ পর্বতের শীর্ষদেশে উঠতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

হিজরী নবম বর্ষের শেষাংশ এবং দশম বর্ষ রসূলে খোদা অতিবাহিত করেন ইসলাম গ্রহণকারী মদিনায় আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গের সংবর্ধনায়। তিনি এক পর্যায়ে হজ্জ আদায়ের কথা ঘোষণা করেন। হিজরী দশম বর্ষে পঁচিশে জিলকদ হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশে বিশ্বাসী সঙ্গীগণকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার পথে মদিনা ত্যাগ করেন। আটই জিলহজ্জ রসূলে খোদা মীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীনার পৌঁছে সেখানে তাঁবু পাতেন এবং রাত্রি যাপন করেন। পরের দিন নয়ই জিলহজ্জ ফজর নামাজের পর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরাফাতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। লক্ষাধিক লোক তাঁকে অনুসরণ করে। আরাফাতের পাহাড় জেবল রহমের কাছে তাঁর উষ্ট্রী এসে থামে। উষ্ট্রীর পিঠে অবস্থানরত অবস্থায় থেকেই রাসূল তাঁর বিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রদান করেন। প্রান্তরে, পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায় সর্বত্র বিপুল জনারণ্য। 'আল্লাহু আকবার' সমস্বরে উচ্চারিত হবার পর রাসূলে খোদা তাঁর ভাষণ দিলেন। তিনি এক একটি বাক্য বললেন এবং তাঁর একটু নিচে অবস্থানরত রাবিয়া ইবনে উম্মাইয়াতা সে বাক্যটি সকলের শ্রবণযোগ্য করে পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, "হে বিশ্বাসীগণ, আমার কথা শোন। সম্ভবত এরপর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। হে জনমণ্ডলী, তোমাদের পরস্পরের জান-মাল পরস্পরের জন্য হারাম বা পবিত্র সাব্যস্ত করা হল কিয়ামত পর্যন্ত যেমন এই মাস এবং দিনকে পবিত্র করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে, যিনি তোমাদের আমল ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। আমার পক্ষ থেকে আমি এ-কথা জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের কারও কাছে গচ্ছিত আমানত মওজুদ থাকলে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। আজ থেকে সকল প্রকার সুদ নিষিদ্ধ করা হল। তোমরা কেবল নিজ নিজ মুনাফা ফেরত পাবে যাতে অন্যায় অবিচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবে না। তোমরা অন্যকে নির্যাতন করবে না এবং নিজেরাও নির্যাতিত হবে না। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপর ও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং শিষ্টাচার বজায় রাখবে।"

এ-সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বশেষ ওহী বা প্রত্যাদেশ এল, 'আলইয়াওমা আকমাল্‌তু লাকুম দীনাকুম ওয়াত্‌মামতু আলাইতুম নেয়মাতি ওরাদ্বীইতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।" অর্থাৎ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

আমি জেবল রহম থেকে একখণ্ড ছোট পাথর কুড়িয়ে আনতে চেয়েছিলাম। ইতস্তত নানা আকারের নুড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তার মধ্যে থেকে একটি তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গী হেলাল নামক একজন বাঙালি যুবক পাথরটি আমার হাত থেকে নিয়ে পাহাড়েই রেখে দিল। বলল, "এখান থেকে নিয়ে গেলে পাথরের টুকরাটি দুঃখ পাবে। বলবে, আমাকে একটি পবিত্র স্থান থেকে সরিয়ে এনেছ। তাছাড়া টুকরোটি দেশে নিয়ে গিয়ে কি করবেন? পবিত্র জ্ঞানে সম্মান জানাবেন তো? সেটা ঠিক হবে না" হেলাল মক্কা শরিফের একটি মসজিদে ইমামতি করে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় বিষয়ে একজন নিয়মিত বিদ্যার্থী। তাওয়াফ এবং সায়ীর সময় সে আমাদের সঙ্গে ছিল এবং দোয়া-দরুদ উচ্চ স্বরে পড়েছে।

আরাফাত থেকে হেরা পাহাড় দেখতে গেলাম। এখানে সে পাহাড়কে বলে জেবল আল নূর অর্থাৎ জ্যোতির পাহাড়। রসূলে খোদা ছিলেন সকল জ্যোতির উৎস এবং একদিন এ-পর্বতে অফুরন্ত জ্যোতির বন্যা নেমেছিল। পৃথিবী সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হয়েছিল। বিপুল এবং বিস্ময়বিমূঢ় শান্ত পরিবেশে একটি নতুন অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা উন্মুখ হয়েছিল। একজন বিনয়নম্র, দীপ্তোজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বে সুনিশ্চয়, প্রজ্ঞায় প্রশান্ত এবং সুনির্দিষ্ট পুরুষ ছিলেন এ-পর্বতের নিত্য সঙ্গী। পর্বতের শিরোদেশে একটি গুহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় যিনি একাকী অবস্থান করেছেন। এখানে অবস্থান কালে একদিন প্রত্যাদেশ এল। তাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রভাময় মুহূর্তকে অপূর্ব ভাষার বর্ণনা করেছেন ইরানের প্রখ্যাত পণ্ডিত যায়নুল আবেদীন রাহনুমা।

১৯৫৭ সালে রাহনুমাকে আমি প্রথম দেখি তেহরানে। তখ্তে জামশিদে অবস্থিত একটি হোটেলে আমি ছিলাম। রাহনুমার পরিচয় জেনেছিলাম বৈরুতের নবিহ আমিন ফারিসের কাছ থেকে। খবর দিতেই আমার হোটেলে এলেন সৌম্যদর্শন, হাস্যোজ্জ্বল শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ। তিনি আমাকে তাঁর রচিত 'পয়ম্বর' বইটি উপহার দেন। সম্প্রতি ঢাকায় রাহনুমার বইটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেখান থেকেই নবুয়ত প্রাপ্তির বর্ণনাটি তুলে দিচ্ছি :

মক্কায় চতুর্দিকে কৃষ্ণকায় রুক্ষ পাহাড়ের সারির উপর প্রভাতের উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত হবার পূর্বেই হেরা পর্বত থেকে একজন পুরুষ শান্ত সতর্কতার সাথে বেরিয়ে এলেন। প্রভাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তিনি শুধু একটি বস্তুকেই দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এক ফেরেস্তার ওপর। ফেরেস্তার বিস্তারিত পাখা দুটি ছিল বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত এবং পা দুটি ছিল ভূমিপৃষ্ঠে স্থাপিত। তাঁর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ জ্যোতিচ্ছটার। বিহ্বল মুহাম্মদ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। প্রত্যুষের আকাশে অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর স্বর্গীয় দূত বলে উঠলেন, "মুহাম্মদ, আপনি এখন আল্লাহ্‌র বাণীবাহক পয়গম্বর।" এর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি যখন হেরার গুহার অভ্যন্তরে জিবরাইল তাঁর কাছে প্রথম ঐশী বাণীর সংবাদ এনেছিলেন। বলেছিলেন, "পাঠ কর।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমি তো পাঠ করতে জানি না।" তখন ফেরেস্তা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বলেছিলেন, "পাঠ কর।" পুনর্বার রাসূল বলেছিলেন, "আমি তো পাঠ করতে জানি না।" ফেরেস্তা আবার তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "পাঠ কর।" তিনি তখন প্রশ্ন করেছিলেন, "কী পাঠ করব?" ফেরেস্তা তখন বলেছিলেন, "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, কেননা তোমার প্রভু পরম কল্যাণময় যিনি লেখনীর প্রয়োগ শিখিয়েছেন, যিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা মানুষের অজ্ঞাত ছিল।"

www.nagorikpathagar.org

এভাবে পরমতম স্বীকৃতিতে বিশ্বপ্রভুর বাণীবাহক হয়েছিলেন মুহাম্মদ। এবং সেদিন থেকেই তিনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

এরপর ফিরে এসেছিলাম হারাম শরিফে। প্রবল আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত অজস্র পুরুষ ও রমণী কাবা গৃহ পরিক্রমণ করছে। আমারও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাওয়াফ শেষে কাবার দেয়ালে হাত রেখে সকল পাপের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলাম এবং হৃদয়ের আর্তি নিবেদন করলাম। সবশেষে কাবার দেয়ালের দিকে মুখ রেখে নফল নামাজের সিজদায় মাথা নত করলাম। নামাজ শেষে বসে আছি এমন সময় জনৈক আরবি মহিলা আমাদের ডিঙিয়ে কাবার দেয়াল স্পর্শ করতে এগিয়ে গেল। তাকে এভাবে এগিয়ে যেতে কর্তব্যরত প্রহরী বলে উঠল, "তুমি কেমনতরো নির্লজ্জ মহিলা যে, পুরুষদের ডিঙিয়ে চলে যাও।" মহিলাটিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "তুমি কেমনতরো নির্লজ্জ পুরুষ যে, মহিলাকে সম্মান করে কথা বলতে জানো না?

এর একটু পরে এশার নামাজ শেষ করে বাসায় ফিরে এলাম।

www.nagorikpathagar.org

মরুভূমির দেশে সূর্যতাপের ভয় আছে, বালুকাঝড়ের ভয় আছে। সুতরাং গৃহ নির্মাণের সময় অন্তরাল খুঁজতে হয় তাপ থেকে এবং ঝড়ের উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা থেকে। তাই সেসব অঞ্চলের বাড়ি-ঘরের বারান্দা নেই, জানালাও অনেকটা না থাকার মতো। এর ফলে বিশেষ ধরনের গৃহ নির্মাণ আঙ্গিক সেখানে গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা ভারনাকুলার বা দেশজ ভাষ্য বলতে পারি। আরব স্থাপত্য সম্পর্কে বলতে গেলে এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মরুভূমিতে বেদুঈনদের বাসগৃহ হচ্ছে তাঁবু যার চতুর্দিকে আবরিত এবং ছাদ হিসেবে এক প্রকার ছুঁচালো বা কৌণিক আচ্ছাদন থাকে। গৃহনির্মাণে এ আকৃতিটি এখানকার আঞ্চলিক দেশজ ভাষ্য। চতুর্দিকের খোলা প্রান্তর থেকে বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে তাঁবুর অভ্যন্তরস্থ অংশ বিশিষ্ট দ্যোতনা লাভ করে। পবিত্র কাবাগৃহের আকৃতিটি লক্ষ্য করবার বিষয়। চতুষ্কৌণিক এ-গৃহের কোথাও জানালা নেই। একটি দরজা আছে মাত্র। কিন্তু ছাদটি সমান্তরাল। তাঁবুর ছাদের মত নয়। এভাবে কাবা গৃহটিও এ-অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্পের দেশজ ভাষ্য।

বর্তমানে মক্কায় যে-সমস্ত গৃহ নির্মিত হচ্ছে সেগুলোর নিজস্ব এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে অভ্যন্তরীণ শোভায় সমৃদ্ধ। বাইরে থেকে এগুলো দুর্গের মতো মনে হয়। জানালা নেই, অনেক উঁচুতে বায়ু প্রবেশের পথ আছে কিন্তু তাও বন্ধ থাকে। যেহেতু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এদেশে সার্বজনীন, সুতরাং জানালার প্রয়োজন হয় না। গৃহের যত কিছু কারুকার্য তার অধিকাংশ অভ্যন্তরভাগের। নতুন কিছু গৃহে বহিরাঙ্গের শোভা আছে কিন্তু মূলত আরব দেশের স্থাপত্য 'আশ্রয় স্থান' বা শেলটার থেকে একটি দেশজ ভঙ্গি থেকে গড়ে উঠেছে। কাবা গৃহের আকৃতি থেকেই আরব দেশের মরুভূমির তাঁবু অথবা খেজুর পাতার ছাউনীর ঘরে তৈরি হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাবা গৃহ একই সঙ্গে যেমন একটি গৃহ তেমনি একটি বিমূর্ত ভাস্কর্য। গৃহটির আকৃতিতে কোথাও পরিমাণগত হেরফের নেই। বিন্যাসগত ব্যতিক্রম নেই। একটি চতুষ্কৌণিক কিউব একটি ভাস্কর্যের নিশ্চয়তায় দণ্ডায়মান রয়েছে।

হযরত মাবিয়ার মৃত্যুর পর মক্কা শরিফের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে। ইবনে জুবায়ের নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। মাবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ পিতার মৃত্যুর পর খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইয়াযিদ ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইবনে জুবায়েরকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে মক্কা অবরোধ করেন। অবরোধকালে কাবা গৃহ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। এর প্রতিফল ইয়াযিদকে সঙ্গে সঙ্গেই পেতে হয়েছিল— কাবা গৃহ ভস্মীভূত হবার পনর দিনের মধ্যেই ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। তখন ইবনে জুবায়ের মক্কায় নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

স্থাপত্যের কৌশলের দিক থেকে কাবা গৃহ নির্মল, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন এবং অফুরন্ত বিনয় ও প্রেমের উৎস। এই বিনয় এবং প্রেমের সমর্থনে কাবা গৃহ মর্যাদাবান এবং ইসলামী উম্মাহ্‌র সকল প্রেরণার কেন্দ্রভূমি। হারাম শরিফের আলোকিত বিপুল চত্বরের মাঝখানে পবিত্র কাবার অবস্থিতি গৃহটিকে অলৌকিক আকর্ষণে মণ্ডিত করেছে। হারাম শরিফের বিপুল চত্বরের উন্মুক্ততা কাবা গৃহটিকে এমনভাবে বেষ্ঠন করে রেখেছে যে, সহজেই এই উন্মুক্ত এলাকার সঙ্গে কাবা গৃহের স্থাপত্যগত একটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কাবা গৃহের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত নয়। কিন্তু চতুর্দিকের উন্মুক্ততা এবং উর্ধ্বাকাশের উন্মুক্ততা কাবা গৃহকে একটি বিপুল উন্মুক্ততার অংশভাগী করেছে। এককভাবে গৃহটি কোনো বিশেষ পার্থিব শিল্পকুশলতা বহন করে না, কিন্তু হারাম শরিফের বিপুল চত্বরের মাঝখানে গৃহটিকে একটি অলৌকিক অবস্থিতি বলে বিশ্বাস জন্মে।

কাবা গৃহটি যখন পুনঃনির্মিত হয় তখন এ-গৃহ নির্মাণের সময় পারস্য দেশের স্থপতিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে কিতাব-আল-আগানীতে উল্লেখ আছে। সে-সময় কাবা গৃহের দেয়াল ছিল দু'হাত চওড়া ও গৃহের উচ্চতা ছিল ২৭ হাত। কাবা গৃহের দরোজাটি ভূমি থেকে ১১ হাত উঁচুতে। ৬৩৮ সালে হযরত ওমরের সময় প্রথম কাবা গৃহের চতুর্দিকে উন্মুক্ত চত্বরের ব্যবস্থা করা হয়। এর পূর্বে চতুর্দিকে বাসগৃহ ছিল। হযরত উমর প্রথম হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে চর্তুদিকের বাড়িগুলো ভেঙে হারাম শরিফের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই উন্মুক্ত স্থানটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এই উন্মুক্ত এলাকাটি হজ্জের সময় বহু লক্ষ মানুষের অবস্থানের অনুকূল হয়েছে । উন্মুক্ত স্থানের চারদিকে একটানা অবরিত স্থান নির্ধারিত হয়েছে। এই স্থানগুলো বহুবিধ খিলানের সাহায্যে অপূর্ব শোভামণ্ডিত। সুউচ্চ মিনারগুলো বিপুল আলোকসম্ভারে সজ্জিত থাকে এবং রাত্রিবেলা অসম্ভব গরম হয় বলে দিনের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে ঘন পর্দা টেনে কাঁচ ঢেকে রাখতে হয়। তখন আবার বিদ্যুৎ বাতি জ্বালাতে হয়। সুতরাং এককথায় বলা যায় প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার নির্দেশেই এখানকার বাসস্থানগুলো বিশিষ্ট আকৃতি পেয়েছে।

আরবদেশের ভাস্কর্য নেই। থাকতেও পারে না, কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো চৌরাস্তার মোড়ে অথবা দীর্ঘ পথের পাশে কিছু কিছু ভাস্কর্য স্থাপিত হচ্ছে। জেদ্দা থেকে মক্কা শহরে প্রবেশের মুখে একটি ভাস্কর্য নিদর্শন আছে— কয়েকটি পানির সুরাহির আকৃতির একটি সমন্বয়। আর এক স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে একটি ছোট মিনারের আকৃতি বসানো হয়েছে। অন্য একটি পথের বাঁকে কয়েকটি পিলার বিমূর্তভাবে সাজানো আছে। জেদ্দা থেকে গাড়ি করে মক্কা শরিফে যেতে ডান দিকে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে একটি বিশিষ্ট আকৃতি গড়ে উঠেছে দেখলাম। সেটি সম্পূর্ণ হলে মনে হবে যেন একটি খোলা রেহেলের ওপর একখণ্ড কোরান শরিফ রাখা হয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস এবং দেশজ ভঙ্গিকে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্ত করার চেষ্টা চলছে।

মক্কা শরিফ এবং মদিনা শরিফের মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ সুন্দর

www.nagorikpathagar.org

মিনারের জন্য। তুরস্কের মসজিদের বৈশিষ্ট্য যেমন গম্বুজের জন্য, আরব দেশের মসজিদের বৈশিষ্ট্য সে ক্ষেত্রে মিনারের জন্য। হারাম শরিফে কোন গম্বুজ নেই। কিন্তু সুউচ্চ এবং সুদৃশ্য কয়েকটি মিনার রয়েছে। কিবলামুখী বলে মসজিদগুলো এক এক এলাকায় এক এক ভঙ্গিতে নির্মিত। কোনো মসজিদের কিবলা পশ্চিম দিকে, কোনোটির উত্তর দিকে, কোনোটির দক্ষিণ দিকে, এ-রকম। বিদেশীদের কাছে প্রথম হঠাৎ এটা বুঝতে অসুবিধা লাগে। অবশ্য অল্পক্ষণেই তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

গৃহনির্মাণে প্রস্তর এবং ইটের ব্যবহার একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম। এদেশে প্রস্তরের অভাব নেই। মক্কা থেকে মদিনার পথের দুপাশে পর্বত শ্রেণী চোখে পড়ে।

মক্কা এবং মদিনা প্রত্যেক মুসলমানের ভালো লাগে একটি ভালবাসার কারণে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা এ-দু'টি নগরীকে অনন্তের প্রতি আসক্তির কেন্দ্রভূমি করেছে। যেমন পৃথিবী এবং বৃষ্টি একে অন্যকে কামনা করে। যেমন নদী এবং সমুদ্র একে অন্যের, যেমন— রাত্রি এবং দিবস একে অন্যের প্রতি সমর্পিত তেমনি পৃথিবীর সকল বিশ্বাসী মানুষ এ-দু'টি নগরীর প্রতি নিবেদিত এবং নগরী দু'টিও উম্মাহর সকল প্রাণকে আকর্ষণ করেছে। মওলানা জালালউদ্দিন রুমী বলেছেন যে, প্রিয়তমার আকর্ষণ না থাকলে প্রিয়তমের আকর্ষণ গড়ে ওঠে না। যখন প্রেমের বিদ্যুৎ প্রবাহ হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই হৃদয় প্রেমের আধার হয়। যখন আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হৃদয়কে প্রসারিত করে তখন মনে রাখবে আল্লাহ্ও তোমাকে ভালবাসছেন। একাকী একটি হাত কখনো তালি দিতে পারে না। তালির শব্দের জন্য দুটি হাতের প্রয়োজন। ঐশ্বরিক যে জ্ঞান সে জ্ঞানের সহায্যেই আমরা ভালবাসতে শিখি। আল্লাহ্র নির্দেশ আছে বলেই পৃথিবীর সর্বত্র যুগ্মতা বিরাজমান। আকাশ হচ্ছে পুরুষ এবং ধরিত্রী হচ্ছে রমণী। আকাশ যা বর্ষণ করে ধরিত্রী তা ধারণ করে। যখন মৃত্তিকার তাপ থাকে না তখন আকাশে বহু দূর থেকে আলোর অভিষেক লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে মদিনা শরিফের মসজিদটি প্রথম বলিষ্ঠ নিদর্শন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা শরীফে মসজিদে নব্বী নির্মিত হয়। এই মসজিদ রসূলে খোদার বাসগৃহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। মসজিদে নব্বী ইসলামী স্থাপত্যশিল্পে পৃথিবীতে প্রথম নিদর্শন। তবে এর পূর্বে কুবা মসজিদ নামে খ্যাত অন্য এক মসজিদের কথা উল্লেখ করতে হয়। মক্কা শরিফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরতের পথে রসূলে খোদা কুবা অঞ্চলে চারদিন অবস্থান করেছিলেন। এই কুবাতে তখন নামাজ পড়বার জন্য যে স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সেখানেই পরবর্তীকালে কুবার বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর মক্কা শরিফ থেকে মদিনা শরিফের উদ্দেশে যাত্রা করে রাসূলে খোদা ২৪ সেপ্টেম্বর কুবায় পৌছান।

মদিনায় পৌছে রাসূলে খোদা প্রথমেই একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর বাসগৃহের স্থান নির্বাচনের জন্য তাঁর উটকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই উট অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য যেখানে থেমেছিল সেখানেই রাসূলে খোদা তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। উট যেখানে থেমেছিল সেই জমি ছিল নাজার গোত্রের সাহাল ও

www.nagorikpathagar.org

সোহায়েল নামক এক এতিম বালকের জমি। রাসূলে খোদা উক্ত জমি ক্রয় করেন এবং সে জমিতে তাঁর বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। এই বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণে সাত মাসের অধিক সময় লেগেছিল। প্রথমে এই বাসগৃহ এবং মসজিদ অতি সাধারণভাবেই নির্মিত হয়েছিল। এতে কোনো ছাদ ছিল না শুধু দেয়াল ছিল। পরে সামনের দিকে আংশিকভাবে ছাদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদটি পৃথিবীর একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থাপত্য। মসজিদে প্রবেশের জন্য কয়েকটা দরোজা ছিল। তার একটি দরোজা বাব জিব্রিল নামে বিখ্যাত। হযরত বিজ্রাইল (আঃ) এই দরোজা দিয়ে রসূলে খোদার গৃহে প্রবেশ করতেন বলে এটাকে বাব জিব্রিল বলা হয়। বর্তমানে মসজিদটি বিস্মিয়করভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একসঙ্গে মসজিদের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক মানুষ যাতে নামাজ পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মাণের বৈশিষ্ট্য এ মসজিদটি একটি অনন্য সাধারণ শিল্প প্রজ্ঞার নিদর্শন বহন করে।

আরব দেশে বর্তমানে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অনেক গড়ে উঠেছে কিন্তু দেশজ ভঙ্গি মৌলিক আবহ বিদ্যমান রাখবার একটি চেষ্টা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। মক্কা শরিফে এবং মদিনা শরিফে বহুতলবিশিষ্ট কয়েকটি ফ্ল্যাট বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে সাধারণত গৃহের অভ্যন্তর ভাগেই সকল কিছু সৌন্দর্য এবং ব্যবস্থাপনা। বাইরের দিক থেকে প্রায় পুরোপুরি আবদ্ধ। দিনের বেলাও ভেতরের কক্ষগুলোতে বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়ে গৃহকে আলোকিত রাখতে হয়। বাইরের আলো ভেতরে গমন করবার ব্যবস্থা খুব কম গৃহেরই আছে। কিছু কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে যেগুলোকে ওয়ান ইউনিট বাড়ি বলা যায়। সে সব বাড়িতে রাস্তার দিকে কাঁচের দেয়াল আছে। কাঁচের দেয়াল মানে খোলা জানালার পরিবর্তে কাঁচের আবরণ নির্মাণ করা হয়েছে। দিনের বেলা এই কাঁচের আবরণ ভেদ করে বাইরের আলো প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কাঁচ থেকে আবার তাপ নামে।

যখন মৃত্তিকার সিক্ততা থাকে না তখন আকাশ সেই সিক্ততা এনে দেয়। আকাশ যখন সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, সে ধরিত্রীকে সুফলা এবং প্রাণবন্ত করতে চায়। মনে হয় আকাশ এবং মৃত্তিকা একে অন্যের লাবণ্যে সিঞ্চিত এবং অভিষিক্ত। পৃথিবী না থাকলে কোথাও পুষ্প থাকত, কোথায় বৃক্ষ মুকুলিত হত? আল্লাহ্ মানুষের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগরুক করেছেন এবং আকাংখার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চায়।

কাবার চত্বরে এসে অজস্র মানুষের সঙ্গে আমি যখন বললাম, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি এসেছি, আমি উপস্থিত, তখন মনে হল অনন্তকাল ধরে এই উপস্থিতির জন্য পরম বিধাতাও অপেক্ষা করছিলেন। আমার মনে হল যুগ যুগ ধরে মানুষের তৃষ্ণা আল্লাহ্র সান্নিধ্য উপনীত হবার। সংসারে নানাবিধ সমস্যা তাকে ব্যতিব্যস্ত এবং ব্যাপৃত রাখে। সে তাই পরম বিধাতার কাছে তার আর্তি নিবেদন করতে পারে না। বিধাতা যখন আহ্বান করেন তখনই সে তার কাছে উপস্থিত হয়। সে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পোশাক পরিধান করে, সংসারের চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে বিশ্ববিধাতার দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে পরম আকুলতায় বলে, "হে প্রভু আমি উপস্থিত, আমাকে গ্রহণ করো, আমার দুর্বলতাসহ আমাকে গ্রহণ করো, আমার জীর্ণতাসহ আমাকে গ্রহণ করো, আমার নিঃস্বতার মধ্যে আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে তোমার আনন্দে পরিপূর্ণ করো, তোমার অস্তিত্বে পরিপূর্ণ করো। আমি একমাত্র তোমার, আমি তোমার বংশবদ। হে প্রভু পার্থিব সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হবার প্রত্যাশায় আমি তোমার সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছি। হে প্রভু আমি উপস্থিত, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।"

www.nagorikpathagar.org

আমি ১৫ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত মক্কা শরিফে ছিলাম। ১৫ মার্চ ওমরাহ সম্পন্ন করলাম। কাবা ঘর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া পরিভ্রমণ শেষে এশার নামাজ পড়ে বাসস্থানে ফিরলাম। ১৬ তারিখে মুজদালেফা, আরাফাত, মীনা এবং হিরা দেখে মধ্যরাত্রিতে আবার কাবাগৃহ তাওয়াফ করলাম। যতদিন মক্কা শরিফে আসিনি ততদিন শুধু কল্পনার মধ্যেই কাবা গৃহ পরিক্রমার কথা ভেবেছি। কিন্তু বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কত দুস্তর যে ব্যবধান তা এখানে উপস্থিত না হলে বোঝা যায় না। এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ একটি সংশয়মুক্ত নির্মল সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ জীবনের জটিলতা থেকে মুক্ত একটি উদার সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া। সকল কর্মের অবসানে একটি অনন্তকাল পরিক্রমার মধ্যে আমরা তাওয়াফের সময় উপস্থিত হই। একজন মুসলমানের যথার্থ বিশ্বাস একটি উপলব্ধির স্বাক্ষরে প্রমাণিত হয় যখন সে কাবাগৃহ পরিক্রমা শেষে আল্লাহ্‌র কাছে আপন নিবেদন উপস্থাপন করে। মানুষ এখানে এসে একটি বিশ্বাসের স্রোতোধারার মধ্যে নিজেকে প্রবাহিত করতে চায়, যে বিশ্বাস, প্রথম পুরুষ হযরত আদম থেকে আরম্ভ হয়েছে।

১৮ মার্চ সকালবেলা বাসে চড়ে মক্কা থেকে মদিনার পথে রওয়ানা হলাম জিয়ারতের উদ্দেশে।

একদিন কাফেরদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রাসূলে খোদা হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে লক্ষ্য করে সর্বদাই মানুষ হজ্জ অথবা ওমরাহ শেষে জিয়ারতের উদ্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় যায়। একদিন কাফেররা যখন রাসুলকে বন্দি করার কিংবা খুন করার অথবা তাকে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্র করছিল আল্লাহ্ তখন কৌশল করেছিলেন এবং রাসূলকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মক্কা ত্যাগের পূর্বে রাসূল রাত্রিতে আপন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আবু বকরকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু বকর বললেন, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

আবু বকরের দুটি উট প্রস্তুত ছিল। সে দু'টি উটে আরোহণ করে এই দুইজন আল্লাহ্‌র পথের পথিক মদিনার পথে রওয়ানা দিলেন। পথের মধ্যে একটি গুহায় তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তখন কাফেরগণ পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই গুহার নিকটে উপস্থিত হয়। কাফেরদের শব্দ শুনে হযরত আবু বকর বললেন, কাফেররা সম্ভবত আমাদের দেখে ফেলেছে। আমি তাদেরকে স্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পাচ্ছি।

রাসূলে খোদা বললেন, শান্ত হও, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন।

রাসূলে খোদা তখন কোরান শরিফের আয়াত পাঠ করলেন, 'এবং স্মরণ করো যখন কাফেররা তোমাকে বন্দী করার কিংবা খুন করার কিংবা তোমাকে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা প্রতারণা করছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

তিন দিন এবং তিনরাত তাঁরা গুহার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। কাফেররা যখন গুহার মধ্যে আর প্রবেশ করল না এবং মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করল তখন রাসূলে খোদা আবু বকরকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। কাফেররা গুহার মুখে মাকড়শার জাল দেখেছিল আর একটি কবুতরের বাসা দেখেছিল। তাতে তাদের ধারণা হয় যে, গুহার মধ্যে কেউ প্রবেশ করেনি। গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ বারের মতো জন্মভূমি মক্কার দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই পৃথিবীর সমস্ত জায়গার চেয়ে তুমি সুন্দর মনে হলেও তোমাকে আমার ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এখানকার মানুষ যদি আমাকে তাড়িয়ে না দিত আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে কোরান শরিফের একটি আয়াত পাঠ করলেন যেখানে বলা হয়েছে, যিনি আপনার ওপর পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।

তাঁদের পথ নির্দেশক ছিলেন ইবনে উরিকাত। ইবনে উরিকাতের তত্ত্বাবধানে রাসূলে খোদা ইয়াসরীব অর্থাৎ মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সাধারণত সবাই যে পথ দিয়ে মদিনায় যাতায়াত করত সে পথে দিয়ে তাঁরা যাননি। প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে, তারপর তিহামা গোত্রের এলাকা অতিক্রম করে লোহিত সাগরের দিকে এবং অবশেষে একটি মোড় ঘুরে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ যাত্রায় উট দুটো কোথাও থামেনি। প্রথম দিন ও রাত তারা কোথাও না থেমে পথ চলেছেন এবং প্রথম দিনের সূর্যাস্ত এবং পরের দিনের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেছেন। সীমাহীন মরুভূমির অসীম নীরবতার মধ্যে রাসূলে খোদা তাঁর সুললিত কণ্ঠে কোরান শরিফ পাঠ করেছেন। কোরানের যে আয়াতটি তিনি প্রথম পাঠ করেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, যে নগরবাসী তোমাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কত নগরবাসীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী হয়নি। যে ব্যক্তি আপন প্রভু থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলিলের উপর নির্ভর করে আছে সে কি সেই ব্যক্তির মতো যে তার আপন কুকর্মের দ্বারা সুশোভিত এবং আপন ইচ্ছার অনুগত? নেককার মানুষের জন্য যে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার অবস্থা এমন যে, সে সেখানে বিশুদ্ধ পানির নহর পাবে এবং দুধের পানির নহর পাবে যার আস্বাদ পরিবর্তিত হয় না।

যাত্রার তৃতীয় দিনে উম্মে মাবাদ নামক এক মহিলার তাঁবুতে তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেখান থেকে যখন চলে যান তখন উম্মে মাবাদের স্বামী তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করে আশ্রিত অতিথিদের সম্পর্কে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ পায়। উম্মে মাবাদ তার

www.nagorikpathagar.org

স্বামীকে বলে, উজ্জ্বল মুখকান্তির এই লোকটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর আচরণ সভ্য এবং ভদ্র। তাঁর মুখমণ্ডল লম্বাও নয়, গোলও নয়, তাঁর চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ, তাঁর মেরুদণ্ড সোজা এবং লম্বা। তাঁর মুখে ঘন দাঁড়ি। তিনি যখন নীরব থাকেন তখন তাঁকে গম্ভীর দেখায়। যখন কথা বলেন, তখন যেন আদেশের ভঙ্গিতেই কথা বলেন। তাঁর আচরণ এমন যে, সবাই তাঁকে মান্য করতে চায়। তাঁর কথা আবেগময় এবং মনোমুগ্ধকর। তাঁর কথা দীর্ঘও নয় এবং স্বল্পও নয়। তাঁর অপর সঙ্গীদের তুলনায় তিনি দেখতে সুন্দর এবং সম্মানের অধিকারী।

উম্মে মাবাদের স্বামী এই বিবরণ শুনে বলল, মক্কায় যে ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা লোকেরা বলছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবি করছেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই লোক। আমি দুঃখিত যে, তাঁর আগমনের সময় উপস্থিত ছিলাম না। উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর সঙ্গেই যাত্রা করতাম।

যে পথ দিয়ে রাসূলে খোদা মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন অবিকল সেই পথ দিয়ে বর্তমান রাস্তা তৈরি হয়নি। তবে কিছু কিছু অংশ পুরনো পথ রেখাকে অনুসরণ করেছে।

মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথিমধ্যে গার এ সোওর বা গুহায় রসূলে খোদা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সে গুহা এখনো আছে। তবে পথিকদের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে তা পড়ে না এবং বাসযাত্রীরা এ গুহা দেখবার সৌভাগ্য পায় না। মক্কা থেকে মদিনাযাত্রার পথের দু'পাশে শিলীভূত পর্বতশ্রেণী। পর্বতগুলো কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তরে আবৃত, দুপুরের রৌদ্রতাপে রুক্ষ পর্বতশ্রেণীও উজ্জ্বল দেখায়। যতই বাস মদিনার নিকটবর্তী হতে থাকে ততই বৃক্ষের শোভা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, পরিপুষ্ট এবং সজীব গাছ বিভিন্ন জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরো কিছু কিছু গাছ চোখে পড়ে। কখনও কখনও বেদুঈনদের তাঁবু পাহাড়ের সানুদেশে খাটানো হয়েছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গতিবিধি দৃষ্টিতে আসে না। শুধুমাত্র দীর্ঘ পথ দিয়ে আধুনিক যন্ত্রযানের দ্রুতযাত্রা দেখা যায়। এক সময় এসব পথ দিয়ে উট যাতায়াত করত। তখন উটই ছিল একমাত্র যানবাহন। মক্কা ও মদিনার দীর্ঘ পথে আমি কোথাও একটি উট দেখিনি, তবে জেদ্দা থেকে মক্কার পথে একটি উট চারণ ক্ষেত্র দেখেছিলাম। আধুনিক নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের সুপরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনায় উটের প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু মরুভূমির ভেতরে এখনও উটই একমাত্র যানবাহন।

মদিনা শরিফে বাসস্টপে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গী খান সাহেব দু'হাতে মালপত্র নিয়ে প্রায় দৌড়াতে লাগলেন। আমি এবং আলী নকী তাঁর সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পারছিলাম না। খান ছুটে চলেছিলেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে। তাঁকে ডেকেও থামাতে পারছিলাম না। অবশেষে মসজিদে নব্বীর বিপরীতে বিপণী কেন্দ্রের পিছনে একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি গৃহের সামনে খান এসে থামলেন। এই গৃহটি একজন বাঙালি ভদ্রলোক মদিনার মেহমানদের জন্য ভাড়া খাটিয়ে থাকেন। তিনি ভাড়া নিয়েছেন একজন আরব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এবং গৃহটিকে অতিথিশালায় পর্যবসিত করেছেন। এই গৃহের নিচের তলায় জানালাহীন একটি কক্ষ আমরা ভাড়া

www.nagorikpathagar.org

নিলাম। এখান থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে একটি পাকিস্তানি রেস্তোঁরায় দুপুরের আহার সেরে আমরা মসজিদে নব্বীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। বর্তমানে মসজিদটির সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

বিপুল আয়তনের এই মসজিদটি স্থাপত্য সজ্জায় অপরূপ এবং পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে খিলানযুক্ত আবরিত অংশ। মাঝখানে বিপুল উন্মুক্ত চত্বর। সম্মুখভাগে প্রশান্ত বিস্তৃত পরিসরের এক পাশে রসূলে খোদার রওজা মোবারক এবং অন্যত্র নামাজ পড়ার ব্যবস্থা। আমরা জোহরের নামাজ শেষ করে রওজা মোবারকের সামনে এলাম। এখানে উপস্থিত হয়ে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তা পৃথিবীর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষ বলতে থাকে : "আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূলের সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আমি সেই মহান নবীর দরোজায় হাজির হয়েছি যাঁর শাফায়াত আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই কবুল হবে। এ মহান দরবার থেকে কেউ নিরাশ হয় না, কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। হে আল্লাহ্‌, তোমার প্রিয়তমের দরবার থেকে আমিও খালি হাতে ফিরে যাব না, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি।"

সকল মানুষ যখন রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তখন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে যে কলগুঞ্জন নির্মিত হয় তা অতুলনীয়। সকলেই বলতে থাকে : "আসসালাতু ওয়াসসালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ—আসসালাতু ওয়াসসালামু অ্যালাইকা ইয়া নবীউল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন, আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়াখাতামুন নাবীঈন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্‌লীল আলামীন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনেবীন।

এই সালাম প্রদর্শনের পর নানাবিধ প্রার্থনায় আকুল কণ্ঠস্বরগুলো উচ্চকিত হতে থাকে বিস্ময়ে বিমূঢ়, আবেগে উচ্চকিত এবং পরম সৌভাগ্য অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সকলেই বলতে থাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সহায়তা এবং শাফায়াত কামনা করি এবং আপনার উপলক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে এই আবেদন পেশ করি যেন আপনার দ্বীন এবং আপনার আদর্শের পূর্ণ অনুসারী অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়।

সকল অনুভূতি হয়তো শব্দে ব্যাঙমায় করা যায়, কিন্তু মসজিদে নব্বীতে রওজা মোবারকের সামনে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তাকে কোনো শব্দের ব্যাখ্যায় মূর্ত করা যায় না। আমার মনে হয়েছিল যেন একটি অনন্ত কাল পরিক্রমায় আমি একটি জাগরুক সত্তার সম্মুখে এসে উপনীত হয়েছি। আমার মনে হয়েছিল জীবনের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করছি। সে আকাঙ্ক্ষা সত্যে সমাবৃত হওয়ার, সে আকাঙ্ক্ষা প্রেমে সঞ্জীবিত হওয়ার, সে আকাঙ্ক্ষা নিবেদনে একান্ত হওয়ার এবং সে আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসের গভীরতায় অবগাহন করার। একজন মানুষের জীবন কী করে তখন সার্থক হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর সহজে কেউ দিতে পারে না। আমার মনে হয় মানুষ যখন

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারে তখন একটি পরিচ্ছন্নতার প্রশান্তির মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণের মধ্যেই তার সার্থকতা।

নবম হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে একদিন রাত্রিতে রাসূলে খোদা জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে প্রার্থনা করলেন : "হে কবরের অধিবাসীবৃন্দ, তোমরা আল্লাহ্‌র অশীসসিক্ত হও। তোমরা শান্তিতে অবস্থান করো। বর্তমানে তোমাদের জন্য কোন শংকা নেই। অন্ধকার রাত্রির বেদনা নেই। যারা বেঁচে আছে এ বেদনা তারাই বহন করছে।

জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে তিনি রাত্রির মধ্যযামে হযরত আয়েশার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর অসুস্থতা দেখা যায়। এরপরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাসূলে খোদার দেহান্তর হয়। মৃত্যুর পূর্বে কন্যা ফাতিমাকে ডেকে তাঁর কানে কিছু বললেন। ফাতিমা ক্রন্দনে আকুল হলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ফাতেমাকে ডেকে আবার কিছু বললেন তখন ফাতিমার মুখ হাস্যে উদ্ভাসিত হল। এই একবার কান্না পরে আবার হাসির তাৎপর্য লোকেরা জানতে চাইলে ফাতিমা বললেন : প্রথমবার রাসূলে খোদা আমাকে জানালেন যে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকট, তখন আমি আমার কান্না থামাতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর পরিজনবর্গের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে যোগ দেব। তখন আমি আনন্দে হেসেছিলাম।"

সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল হযরত আবু বকর যখন নামাজ পড়াচ্ছিলেন তখন হযরত আয়েশার কক্ষের দরোজা খুলে গেল এবং রাসূলে খোদা আলী এবং আল-ফজল এ দুজনের সাহায্যে ধীরে ধীরে মসজিদে এলেন এবং আবু বকরকে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দিলেন। এটাই রাসূলের শেষ জামাত।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আয়েশার ক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৃহের রমণীকুল তখন সমস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। ক্রন্দনের শব্দ শুনে মুসলমানগণ মসজিদে সমবেত হয়। তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, রাসূলে খোদার মৃত্যু হয়েছে। তারা বলতে থাকে, কী করে তাঁর মৃত্যু হতে পারে? আমরা কি বিশ্বাস করি না যে শেষ বিচারের দিন তিনি আমাদের অবস্থার সাক্ষী হবেন? তিনি মরেননি। তিনি হযরত ঈসার মতো বেহেশতে গমন করেছেন। হযরত উমর তখন বললেন, তাঁর মৃত্যু নেই— তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। সাক্ষাতের পর আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন। হযরত মুসা আল্লাহ্‌র কাছে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, ৪০ দিন পর তাঁর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তেমনি আমাদের রাসূলও প্রত্যাবর্তন করবেন।

হযরত আবু বকর হযরত উমরকে এবং উপস্থিত বিশ্বাসীগণকে শান্ত করে বললেন হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা মুহম্মদের প্রতি বিশ্বাস এনে থাকো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য এনে থাকো, তাহলে জেনে রাখো যে মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ চিরকাল বেঁচে আছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। তোমাদের কি কোরান শরিফের সেই

www.nagorikpathagar.org

আয়াতের কথা স্মরণ নেই যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, "মুহাম্মদ একজন আল্লাহ্‌র পয়গম্বর। তাঁর পূর্বে যত পয়গম্বর এসেছেন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, যদি মুহাম্মদের মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তখন কি তোমরা পলায়ন করবে? হে মুহাম্মদ, তুমি যথার্থ মরণশীল এবং তোমার পূর্ববর্তী সকলেই মরণশীল ছিলেন।"

এরপর আয়েশার গৃহের যে-স্থানে তিনি শয়ন করতেন ঠিক সেই স্থানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে মসজিদে নব্বীর মধ্যে এক প্রান্তে এই রওজা মোবারক স্থাপিত। রওজা মোবরক সম্পূর্ণভাবে আবরিত। ভেতরে প্রবেশ করবার অধিকার কারোর নেই। রওজার দেয়ালও কেউ স্পর্শ করতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করতে হয়। রওজা মোবারক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে ডান দিকে বাবে জিব্রিল। এ দরোজা দিয়ে হযরত জিব্রাইল রসূলের কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা নিয়ে আসতেন।

আমরা ১৮ এবং ১৯ মার্চ মদিনা শরিফে ছিলাম। ২০ মার্চ দ্বিতীয়বার ওমরাহ করার উদ্দেশে মক্কা প্রত্যাবর্তন করলাম।

www.nagorikpathagar.org

মক্কা থেকে মদিনার পথে একটি তীব্র অনুভূতিতে সমগ্র দেহ-মন পরিপ্লাবিত ছিল। তাই তখন বাসের মধ্যে কে কী আচরণ করছে তা দেখবার এবং তা নিয়ে ভাববার সময় পাইনি। কিন্তু এবার মদিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে কিছু লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার আমার বিবেচনায় ঘটেছিল, সে-কথা একটু বলব। ২০ তারিখে জুমার নামাজ মসজিদে নব্বীতে আদায় করে বাসে উঠেছিলাম— আমি, আলী নকী এবং ইঞ্জিনিয়ার খান। খান এবং আলী নকী এক পাশের দুটি সীটে বসেছিল, অন্য পাশের সীটে জানালার দিকে আমি ছিলাম এবং আমার পাশে ছিল এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক। আমরা সবাই ওমরাহ্‌র কাপড় পরে ছিলাম। মক্কা শরিফ ওমরাহ্‌ করে মদিনায় যাওয়ার পর আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার ওমরাহ্‌ করতে হয়। যারা জেদ্দায় চলে যান তাদের কথা আলাদা। দুটোয় বাস ছাড়ার কথা, ছাড়ল আড়াইটায়। আমার পাশের ভদ্রলোক আমার পরিচয় নিতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। মনে হল ভদ্রলোক কথা না বলে চুপ করে থাকতে পারেন না। নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন জানলেন যে আমি বাংলাদেশী তখন হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের অবস্থা ভালোই তো ছিল, না?"

আমি হঠাৎ এ-প্রশ্নে চমকে উঠলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম যে আশেপাশের কয়েকজন পাকিস্তানী আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। কোনোরূপ বিবাদের আশংকা না ঘটে সেজন্য আমি সংক্ষেপে বললাম, "হ্যা, ভালোই ছিল।"

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, "স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ এখন কেমন আছে?"

লোকটি আবার প্রশ্ন করল, "বাংলাদেশ কি হওয়ার দরকার ছিল?" আমি এবারে উত্তর করলাম, "নিশ্চয়ই, আগে একটি মুসলমান দেশ ছিল, এখন দুটি মুসলমান দেশ হয়েছে।"

লোকটি তখন চুপ করল। কিন্তু কথা বলা যাদের অভ্যাস তারা থামতে পারে না। লোকটি কিছুক্ষণ পর জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করে কালো পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "দেখা? সব লোহা হ্যায়।"

আমি ভাবলাম লোকটি পাহাড়ের কালো পাথরগুলো যে লোহার মতো দেখাচ্ছে তাই বোঝাতে চাচ্ছেন। আমি সায় দিলাম, "হ্যাঁ, লোহার মতোই মনে হচ্ছে বটে।"

কিন্তু আমার কথায় লোকটি যা বলল তাতে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। লোকটি বলল, "আপনি মনে হচ্ছে বলছেন, এগুলো তো সত্যি লোহা।"

www.nagorikpathagar.org

আমি তখন বুঝলাম এর ধারণা যে, পাহাড়গুলো লোহার তৈরি। সুতরাং এর সঙ্গে কোনরূপ সংলাপে অংশ নিয়ে লাভ নেই ভেবে আমি হেসে চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, হঠাৎ লোকটি চিৎকার করে উঠল, "উয়ো, দেখো দেখো, মারিজোনা পাতা হ্যায়।"

ঘটনাটা হয়েছে কী খানের খৈনি খাওয়ার অভ্যাস। সে তামাক পাতার মধ্যে চুন লাগিয়ে হাতের তালুতে ডলে ছোট ছোট গুলি বানিয়ে দাঁতের গোড়ায় দিচ্ছিল। এটা দেখেই লোকটি চিৎকার করেছে। খান লোকটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "ইয়ে তাম্বাকু হ্যায়।"

লোকটি তবু বলল, "তাম্বাকু খানাভি ঠিক নেহী।"

খান তখন ক্রুদ্ধ স্বরে লোকটিকে বলল, "আমি তাম্বাকু খাই আর যাই খাই তাতে আপনার কী?" ক্রমশ স্বর উচ্চগ্রামে উঠছিল। গোলোযোগের শব্দ শুনে বাসের কন্ডাকটার এগিয়ে এসে কয়েকবার 'খালাস খালাস' বলে সবাইকে থামিয়ে দিল। আমি নকী 'শুকরান লাক' বলে লোকটিকে ধন্যবাদ দিল।

এই ঘটনা আমি একটু বিস্তারিত বললাম এই কারণে যে, মক্কা ও মদিনায় সাধারণ বাঙালিরা পাকিস্তানীদের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন। পাকিস্তানীদের সংখ্যাও এ দু'টি শহরে অনেক বেশি। পাকিস্তানীদের ক্ষোভের একটি অর্থনৈতিক কারণ আছে। মক্কা ও মদিনায় কিছু কিছু চাকরি, যেগুলো এককভাবে পাকিস্তানীরাই করত সেখানে বাঙালিরাও এসে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে ছোটখাটো ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে পাকিস্তানীদের কিছু ক্ষোভ থাকতেও পারে। যতদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল ততদিন এদেশে পাকিস্তানী প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি মনোভঙ্গি গড়ে দিয়েছিল যার ফলে বাংলাদেশ হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত সৌদিরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতি দেওয়ার পরও ভ্রান্ত ধারণা এখনো অপনোদিত হয়নি।

আমার মনে আছে ১৯৭৮ সালে মক্কা শরিফের একজন ইমাম ঢাকায় এসেছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর নানারকম সংশয় ছিল। তিনি এক পর্যায়ে এখানে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সমান বা কম। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যাদি কিছু পাকিস্তানী লোকেরা আরবদেশে ছড়িয়েছিল। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও আছে। বহু বাংলাদেশী কর্ম সংস্থাপনের আশায় বিভিন্ন দালালের খপ্পরে পড়ে এদেশে এসে জেলে যায় বা হাজতবাস করে। এসব লোকেরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যে পরিচয় নির্মাণ করে তা মোটেই সম্মানজনক নয়। অনেক বাঙালী আবার জাকাতের জন্য হাত বাড়ায়, যার ফলে তারা স্থানীয় মানুষের কাছে কোনো সম্মান পায় না।

মদিনা শরিফে একটি ছোট পাকিস্তানী হোটেলে আমরা একদিন খেতে বসেছিলাম। যে ঘরে আমি বসেছিলাম তার বাইরে একটি খোলা জায়গায় আরো কিছু লোক খেতে বসেছিল। এরা সবাই সিলেটি ভাষায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আলোচনা করছিল। এদের মধ্যে একটি লোক অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছিল, 'আমাকে তো

www.nagorikpathagar.org

আপনারাই ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এখানে এসে দেখি সব ভূয়া। শেষপর্যন্ত আমি পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি। কিছুদিন বন্ধুদের সঙ্গে মরুভূমিতে ছিলাম।" আরো অনেক কথার মধ্যে আমি এই কথাগুলো ধরতে পেরেছিলাম। যাইহোক আমাদের খাওয়া শেষ হতে আমরা ঘরে থেকে বেরুলাম। কিন্তু খান এক কান্ড করে বসল। সে হঠাৎ ওদের টেবিলের কাছে এসে বলল, "জোরে জোরে কথা বলে বিপদ টেনে আনবেন না, এখানকার পুলিশরা বাংলাও তো জানতে পারে।" খান-এর কথা শেষ না হতেই লোকটি চেয়ার ফেলে দিয়ে একটি পানির গ্লাস উল্টিয়ে দৌড়িয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। যারা তার সঙ্গে কথা বলছিল তারা কোনোরূপ বাধা দেওয়ার সুযোগই পেল না। আমরা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এলাম।

কিছু কিছু বাংলাদেশী এখানে এসে ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে। স্বনামে ব্যবসা করা অসম্ভব, সুতরাং সৌদী পার্টনার নিয়ে ব্যবসা করতে হয়। এরকম কয়েকজন বাংলাদেশীকে আমি মদিনা শরিফে দেখেছি। চট্টগ্রাম এজেন্সি নামে একটি ছোটখাটো দোকান মসজিদে নব্বীর বিপরীত রাস্তায় দেখেছি। দোকানে যে ভদ্রলোক ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, দোকানের মালিকানা স্বত্ব একজন সৌদির নামে। বাঙালি ভদ্রলোকই সবকিছু করে, মাসের শেষে লভ্যাংশের অর্ধেক সৌদি লোকটির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মসজিদে নব্বীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে যারা নিযুক্ত আছে তাদের মধ্যে আমি দু'তিনজন নোয়াখালী এবং কুমিল্লার লোক পেয়েছিলাম।

যাঁরা হজ্জে গিয়েছেন তাঁদের কারো কারো মুখে আমি মদিনার পথে একটি রেস্তোরাঁর মাছ ভাজার কথা শুনেছিলাম। আমাদের বাস যখন মক্কার পথে বিশ্রামের জন্য সেখানে থামল তখন আমরা ভাত এবং মাছ ভাজার অর্ডার দিলাম। অর্ডার নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কবীর না সগীর চাই অর্থাৎ বড় মাছ চাই না ছোট মাছ চাই। কিন্তু খাবার টেবিলে মাছ দেখেই আমাদের চোখ বড় হয়ে গলে। আমরা ছোট মাছের অর্ডার দিয়েছিলাম। ছোট, কিন্তু আসলে ছোট নয়। একটি ১৭/১৮ মতো লম্বা, পুরো মাছটি কোনরূপ মশলা ছাড়া শুধু তেলের মধ্যে ভেজে এনেছে। লবণ ছিটিয়ে খাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভেতরটা সম্পূর্ণ কাঁচা থাকায় খেতে পারলাম না। খান কিন্তু খেয়ে নিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে, সুতরাং খেতেই হবে।

এদেশে মানুষের খাদ্য-স্বভাবে কোনো বিলাসিতা নেই। অতীত কাল থেকেই এসব অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আহার্য গ্রহণ করেছে, স্বাদের জন্য নয়। রাসূলে খোদা নিজে পরিমিত আহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কখনও তিনি বিলাসবহুল খাদ্য খেয়েছেন এমন ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তিনি ফল খেতেন, মধু খেতেন, রুটি খেতেন। তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন, যা কিছু খেতেন একটি পরিচ্ছন্নতার আবহে খেতেন। আমি এদেশে ময়দার তন্দুরী নানরুটি খেয়েছি। অপূর্ব সুস্বাদু বিরাট আকারের গোলাকৃতি রুটি, একটি রুটি চারজনে খেতে পারে। ময়দার মধ্যে কিছু জিরার গুড়ো এবং কিছু আদার গুড়ো আর লবণ দেওয়া হয় যার ফলে একটি বিশিষ্ট ধরনের স্বাদ আসে। তবে এখন আধুনিক সময়ে আধুনিক প্রকরণে জীবনের যে নতুন

www.nagorikpathagar.org

পরিচয় নির্মিত হচ্ছে সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের খাবারই আরব ভূখণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে। বড় বড় হোটেল এবং বিভিন্ন দেশীয় রেস্তোরাঁ সকল বড় শহরেই আছে। তার ফলে খাদ্য ব্যবস্থায় প্রাচীন রীতি প্রকরণগুলো এখন আর তেমন বিদ্যমান নেই। অবশ্য বেদুঈনরা— যাদেরকে নগরীর শৃংখলার মধ্যে কোনোক্রমেই বাঁধা যায়নি, তারা এখনো আদিম স্বভাবের জীবন যাপন করে। তারা এখনো ছোট ছোট বন্য জন্তু শিকার করে খায়। এগুলোর মধ্যে খরগোশ আছে এবং গোঁসাপের মতো এক ধরনের চতুষ্পদ জন্তু আছে, যেগুলো বালুর ভেতর গর্ত করে থাকে। সৌদী প্রশাসন বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে এদেরকে নগরমুখী করতে। কিন্তু পারেনি। জেদ্দা থেকে মক্কার পথে, পথের একদিকে একটি বাসগৃহ প্রকল্প লক্ষ্য করেছিলাম। সেগুলো যাযাবর বেদুঈনদের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারা এই শৃংখলার জীবন মেনে নিতে পারেনি। তারা আবার মরুভূমিতে চলে গিয়েছে। দীর্ঘকালের উন্মুক্ত জীবনের একটি বিশ্বাস এবং বরাভয় আছে, যা ফেলে কেউ সভ্যতার বন্ধনে আসতে চায় না। বেদুঈনদেরও তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করছে। তাই তারা নিয়মিত জীবনধারাকে মান্য করতে পারছে না। যাদের চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন হয় তারা কি কখনো একটি গৃহের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে! তবে এদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এরা একসময় অসম্ভব হিংস্র এবং নিষ্ঠুর ছিল। অজানা পথচারীকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। আজ সর্বত্র নিয়ম এবং শাসনের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বেদুঈনরা তাদের দস্যু জীবন পরিবর্তন করেছে। কিন্তু দ্বিধামুক্ত ভ্রমণ এবং যাযাবরবৃত্তি পরিবর্তন করেনি। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মুক্ত বিচরণের ক্ষেত্রগুলো যখন সংকুচিত হয়ে আসবে তখন এরা পুরোপুরি সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের জীবনে মাশরেক, মাগরেব, শিমাল বা জুনুব বলে কোনো দিক নেই, সকল দিকেই এরা বিচরণ করে এবং দূরে-কাছের সব জায়গাতেই এদের পদচারণা। এদের কাছে বুকরা বা আগামীকাল বলে কোনো জিনিস নেই, এদের সবকিছুই বর্তমানকে নিয়ে অর্থাৎ এরা একটি সময়কেই চেনে যেটি হচ্ছে বর্তমান সময়— এরা তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত কিছু পেতে চায়। তাই দীর্ঘপথ উট ছুটিয়ে চলে, বিশ্রামকে প্রায়ই তারা অস্বীকার করে। এই জীবনের যে মাদকতা এরা লাভ করেছে, সেই মাদকতা এরা কখনও অস্বীকার করতে পারে না। মরুভূমির একটি আহ্বান আছে, যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এককালে বহু মানুষ গৃহহারা হয়েছিল। এখনও বেদুঈনরা সেই আহ্বান মান্য করে চলেছে। মরুভূমির এই যাত্রাপথে উট তাদের নিত্যসঙ্গী। বেদুঈনদের সৌজন্য তাদের উটকে নিয়ে। এখানকার একজন আমাকে বলেছিলেন যে, উট এদের ভাষা বোঝে এবং এরাও উটের ভাষা বোঝে। একটি প্রাণী এবং একজন মানুষ একটি সুনিশ্চয় মমতার বন্ধনে আবদ্ধ।

রাসূলে খোদা একটি উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে মদিনা প্রবেশ করেছিলেন। কুবা থেকে ইয়াসরিব বা মদিনায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন বিজয়ীর বেশে। পথের দুপাশে কিশোর কিশোরীর দল অপূর্ব উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হয়ে রাসূলকে স্বাগত জানাল। তাঁরা দাঁড়িয়েছিল গৃহের অলিন্দে, দরজায় এবং পাহাড়ের সানুদেশে। সেদিন সমস্বরে স্বাগত

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গীত হয়েছিল : পূর্ণচন্দ্র জেগেছে আকাশে। সান্নিয়াতুল বিদা অতিক্রম করে পূর্ণচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। অজস্র প্রশংসা মহান আল্লাহ্র প্রতি, আমরা আমাদের পবিত্রতম অর্ঘ্য তাঁর প্রতি নিবেদন করছি। যে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ, আপনি আমাদের যা আদেশ করবেন তা আমরা পবিত্রতম শুদ্ধিতে পালন করব।

মদিনার অভ্যন্তরে যে-সমস্ত এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সে-সমস্ত এলাকার গোত্র প্রধানগণ রাসূলের উষ্ট্রী রজ্জু ধরে রসূলের যাত্রা বিরতি কামনা করছিলেন এবং বলেছিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন। আপনি এখানে ঐশ্বর্য পাবেন, শক্তি পাবেন এবং নিরাপদ আশ্রয় পাবেন।

সকলকেই রাসূলে খোদা একই উত্তর দিচ্ছিলেন, আমার উষ্ট্রী যেখানে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় থামবে সেখানেই আমি অবস্থান করব।

তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে হাস্যমুখে সকলের কল্যাণ কামনা করছিলেন, বলছিলেন, আল্লাহ্র আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

রাসূলে খোদা তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম ঢিলে করে দিয়েছিলেন এবং উষ্ট্রী নিজের ইচ্ছায় চলছিল। সে তার ঘাড় এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে স্থান নির্বাচনের চেষ্টা করছিল। অবশেষে একটি খোলা জায়গায় উষ্ট্রী হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। কিন্তু রাসূলে খোদা উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন না। তখন উষ্ট্রী আবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল। পরক্ষণেই পূর্বের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং সম্পূর্ণ গলা মাটির সঙ্গে লাগাল। রাসূলে তখন উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন এবং বললেন : আল্লাহ্র নির্দেশে এখানেই আবার বসতি হবে।

রাসূলের জীবনে এই ঘটনায় উটের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পবিত্রতম নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

মক্কা শরিফে পৌঁছলাম রাত ন'টায়। পথে কয়েক জায়গায় বাস থেমেছিল। এক জায়গায় ওমরাহ্র নিয়ত করবার জন্য, এক জায়গায় খাবারের জন্য, এক জায়গায় আছরের নামাজ এবং আরেক জায়গায় মাগরেবের নামাজের জন্য। তাছাড়া বাস চলছিল খুব আস্তে। সুতরাং দেরি হওয়াটা স্বাভাবিক। সেদিন ২০ মার্চ বাসায় ফিরে খান আমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। ফ্রিজের মধ্যে মুরগী ছিল। ভাত, ডাল এবং মুরগি এসব খেয়ে ওমরাহ্র জন্য প্রস্তুত হতে রাত ১২টা বাজলো। রাত ১২টার সময় শেষ ওমরাহ পালনের জন্য হারাম শরিফে প্রবেশ করলাম। বিদ্যুতের আলোয় প্লাবিত হারাম শরিফের বিশাল চত্বরে তখনও অগণিত লোক। আমরা কাবা গৃহ পরিক্রমণ আরম্ভ করলাম। পরিক্রমণের সময় বার-বার বালতে লাগলাম : "হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করো এবং হালাল বস্তু দান করো। তুমি আমাকে একমাত্র তোমার মুখাপেক্ষী করো। আমি যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না থাকি। হে আল্লাহ্ তোমার এ-গৃহ অত্যন্ত পবিত্র এবং তোমার অনুগ্রহ অপরিসীম। তুমি অত্যন্ত ধৈর্যশীল পূণ্যবন্ত এবং দয়ালু। তুমি ক্ষমাশীল। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিক্রমণের শেষে হিজরে আসওয়াদ চুম্বন করবার সুযোগ হয়েছিল।

মকামে ইব্রাহীমের কাছে এসে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে জমজমের পানি পান করলাম। তারপর সাফামারওয়া সায়ী করলাম। আমার শরীর দুর্বল ছিল বলে আমি চেয়ারে বসে সায়ী করলাম। এখানে দুর্বল এবং অসুস্থ লোকদের জন্য চেয়ারে বসিয়ে সায়ী করানোর রীতি আছে। যে লোকটি আমার চেয়ার ঠেলে সায়ী করাল সে লোকটিও দোয়া-দরুদ জানে এবং বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় দোয়া পড়েছিল। ওমরাহ্ শেষে হলো রাত দুটোয়। তখন চুল কামাতে হবে। চুপ অবশ্য তিন-চার দিনে খুব বড় হয়নি। তবু নিয়ম পালন করতে হবে। অত রাত্রে কোথাও নাপিত পেলাম না। খান বলল যে, ঘরে গিয়ে মাথা কামিয়ে দেবে। সে-ব্যবস্থাই ঠিক রইল। বাসায় ফিরে মাথা কামিয়ে গোসল করে শুয়ে পড়লাম। রাতে স্বপ্ন দেখলাম, একটি গোলাপের বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি এবং অজস্র ফুলের সম্মিলিত সুঘ্রাণে আচ্ছন্ন হচ্ছি। এভাবে পরম আচ্ছন্নতায় অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম।

পরের দিন ২১ মার্চ মক্কা শরিফে আমাদের শেষ দিন। শহরটি ঘুরে দেখলাম। কিছু জিনিস কিনলাম। বিকেল বেলা জান্নাতুল মাল জেয়ারত করতে গেলাম। জান্নাতুল মালে হযরত খাদিজাতুল কুবরার মাজার রয়েছে। এর ভেতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। আমরা দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলাম। মদিনা শরিফে মসজিদে নব্বীর অত্যন্ত নিকটে জান্নাতুল বাকী রয়েছে। সেখানে আছে রাসূলে খোদার দুধ-মা হালিমার কবর, বিবি আয়েশার কবর এবং অন্যান্য বিবিদের কবর। হযরত ওসমানের কবরটিও জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত। জান্নাতুল বাকী একসময় বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন খুলে দিয়েছে। আমরা জান্নাতুল বাকীর কয়েক জায়গায় ফাতেহা পড়েছি এবং ঘুরে ঘুরে দেখেছি। রাসূলে খোদা শবে বরাতের রাত্রিতে এবং আরো বিভিন্ন সময় জান্নাতুল বাকীতে আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল থাকতেন।

মাগরেব এবং এশার নামাজ হারাম শরিফে পড়লাম। বাসায় ফিরে রাত্রির আহার সমাধা করলাম। এখানকার কিছু বাঙালি ছাত্র রাত্রিবেলা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক আমাদের খাবারের জন্য উটের গাশত রান্না করে এনেছিল। গরুর গোশত থেকে কোনো পার্থক্য বুঝলাম না। অন্য এক ভদ্রলোক কিছু ফল নিয়ে এসেছিল। ফলের মধ্যে আম ছিল, আপেল ছিল, কুল ছিল। এসব ফল আসে পাকিস্তান এবং ভারত থেকে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খেলাম।

পরের দিন ২২ মার্চ কাবা গৃহে শেষ তাওয়াফ করার জন্য গেলাম। শেষ তাওয়াফের প্রয়োজন এভাবে সবাই ব্যক্ত করেন যে, মক্কা শরিফ থেকে বিদায়ের পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়া সকলেরই কর্তব্য। মূলত মক্কা শরিফে ওমরাহ্ বা হজ্জ সম্পন্ন করে মদিনা শরিফ জিয়ারত করে আবার মক্কা শরিফে প্রত্যাবর্তন করা রাসূলের সুন্নতকে অনুসরণ করা। তিনি মক্কা শরীফ থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং বিদায় হজ্জের জন্য আবার মক্কা শরিফে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। শেষ তাওয়াফ করবার সময় আমি এবং আলী নকী আমরা উভয়েই আবেগ আপ্লুত ছিলাম। চোখের পানি বাধা মানছিল না। বার-বার বলছিলাম, "হে

www.nagorikpathagar.org

আমার প্রভু তোমার কৃপায় পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এই সৌভাগ্যের বরাভয় দ্বারা তুমি আমার জীবনকে সমাচ্ছন্ন করো। সে আমার প্রভু, তুমি তো সর্বত্রই আছো। কিন্তু এই একটা স্থানে আমি সর্ববন্ধন এবং আকষর্ণমুক্ত হয়ে তোমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছি। এই অনুভূতিকে আমার জীবনে সার্থক করো। মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য তোমার নির্দেশ পালন করা এবং তোমারই আজ্ঞায় পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করা। পৃথিবীর মালিন্য আমাদের সকলকেই স্পর্শ করে। কিন্তু তোমার কৃপা ও সহানুভূতিতে আমরা পরিচ্ছন্ন হবার সুযোগ পাই। মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। কিন্তু পার্থিব আকাঙ্ক্ষার শেষ পৃথিবীতেই। আমি তোমার উজ্জ্বল দীপ্তির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হতে চাই। সকল অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত করে হে প্রভু, তোমার আনন্দে আমাকে আনন্দিত করো। একটি পরিচ্ছন্নতা এবং একটি পরিশুদ্ধতার মধ্যে আমাকে জাগ্রত করো। হে আমার প্রভু, আমি তোমার নিকট উপস্থিত।"

মক্কা শরিফ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে খান সরলভাবে বলেছিল, "এবার কিন্তু হজ্জ আপনার জন্য ফরজ হল।" আমি উত্তরে বলেছিলাম, "সবই তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ছিল বলেই আমি এবার আসতে পেরেছি। তাঁর কৃপা এবং ইচ্ছা থাকলে আমি নিশ্চয়ই হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করব।"

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর আরব জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে এবং সে-সমস্ত স্থানকে কুসংস্কারমুক্ত করেছে। সূচনালগ্নের সেই সৌভাগ্যের কথা আমরা যদি স্মরণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই কিভাবে সেই যুগের মানুষ সমুদ্র পার হয়েছে, পাহাড় অতিক্রম করেছে এবং দুর্গম অপরিচিত স্থানে নতুন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে তারা তুখারিস্তানে পূর্ণ প্রতাপ নিয়ে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুখারিস্তান ছিল তখন বৌদ্ধদের সাধনকেন্দ্র। অজস্র বৌদ্ধ মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত ছিল। সেখানকার মানুষ তাদের নির্জন প্রকোষ্ঠ এবং প্রতিমার বন্ধন ছেড়ে ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রতাপী আরবগণ অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করেনি। সে-সময় আরবরা যে-সমস্ত অঞ্চলে গিয়েছিল সে-সমস্ত এলাকার সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়েছিল। তাই আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরব সংস্কৃতিকে পাই না। কিন্তু আপন আপন স্বদেশের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের বিকাশ লক্ষ্য করি। উম্মাহ্ শব্দটার বিশেষ অর্থ হচ্ছে, একই বিশ্বাসে বলীয়ান এবং সমৃদ্ধ বিশ্ব মানবগোষ্ঠী। এখানে দেশ কাল এবং ভৌগোলিক প্রত্যয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় না। এখানে দেশ-কাল অতিক্রান্ত একটি প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে।

মক্কা শরিফে এসে হারাম শরিফের অভ্যন্তরে এবং মসজিদে নব্বীর ভেতরে আমি বিশ্ব মানবতার একীকরণের নিদর্শন দেখেছি। কত দেশের মানুষ যে এখানে আসে তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন স্বাভাবের মানুষ এবং বিভিন্ন ইতিহাসের মানুষ একই ইচ্ছায় এখানে মিলিত হয়। সেই ইচ্ছা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং বিশুদ্ধতা আর পরিচ্ছন্নতার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা।

পৃথিবীতে বিস্ময় আছে অনেক কিন্তু পরম বিস্ময় এটাই যে, বহু যুগ অতিক্রান্ত হলেও একই প্রকৃতির আচার নিষ্ঠার মধ্যে বিশ্বের অগণিত মানুষ একত্র হচ্ছে এবং

www.nagorikpathagar.org

সম্মিলিত কণ্ঠে বলেছে, "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক"— হে প্রভু আমি উপস্থিত।

মানুষের জ্ঞান অর্জিত এবং অসম্পূর্ণ কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞান মৌলিক, সম্পূর্ণ ও চিরন্তন। সৃষ্টি সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞান সৃষ্টির অস্তিত্বের পর অর্জিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র জ্ঞান পূর্ব ও আদি। ভূত ও ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান এবং আগামীকাল সবকিছুই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জাগ্রত হয়েছে। তিনি তো অন্তর্যামী। মানুষের জ্ঞান কখনোই নির্ভুল নয়। মানুষ ঘটনা এবং সৃষ্টি অনুষ্ঠানের অংশমাত্র কিন্তু তার অধিকারী নয়। ভবিষ্যৎ কী হবে সে কিছুই জানে না। সেই কারণে অসম্পূর্ণ মানুষ পূর্ণ প্রজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করে। হজ্জ এবং ওমরাহ্ এই আত্মসমর্পণেরই নিদর্শনসমূহ।

আমি কোন ইচ্ছার বশংবদ তা আমি জানি না। তবে আমি জানি যে, আমি যদি আমার সকল বিশ্বাস মহান আল্লাহ্‌র কাছে ন্যস্ত করতে পারি তাহলেই আমার মুক্তি আসবে। 'হে প্রভু আমি উপস্থিত' এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমরা সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করি এবং আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণ নিবেদনের প্রত্যয়ে কাবা গৃহে পরিক্রমণ করি।

এ পরিক্রমণ কোনো দিন শেষ হবে না।

—

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org